প্রথম অধ্যায়

দোষে গুণে মানুষ, তবুও সাধু প্রণম্য

মর্টন স্কুল। শীতকাল। এখন সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীম চারতলার নিজের ঘরে বসিয়া আছেন বিছানার উপর পশ্চিমাস্য। ছোট নলিনী, বড় অমূল্য ও জগবন্ধু ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম সস্নেহে বলিলেন, এই নিন। আপনারা এটা খান, শরবতী লেবু। তিনজনে ভাগ করিয়া প্রসাদ পাইলেন। একটি ভক্ত নিচে গিয়া বাটিটা ধুইয়া আনিলেন। এবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি বললেন বক্তৃতায়?

বড় অমূল্য — ভক্তির সম্বন্ধেই বললেন। কিন্তু জ্ঞানযোগের কথায় সন্ন্যাসকে আক্রমণ করেছেন আর সন্ন্যাসী সাধুদের নিন্দা করেছেন। বললেন, কলিতে সন্ন্যাস চলে না। আজকালকার সন্ন্যাসীর আদর্শ নীচু হয়ে গেছে। ভাল ভাল কম্বলের স্তূপের উপর বসে থাকে। উত্তম সোয়েটার গায়ে পরে। এর চাইতে ভক্তিযোগ নিয়ে গৃহস্থাশ্রমে থাকা ভাল। ইত্যাদি।

থিয়জফিক্যাল সোসাইটি। রাধাবিনোদন গোস্বামীর বক্তৃতা। বিষয় ভক্তিযোগ। বড় অমূল্য ও জগবন্ধু ঐ বক্তৃতা শুনিয়া ফিরিয়াছেন।

শ্রীম সন্ন্যাস ও সাধুর উপর আক্রমণ হইয়াছে শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন। বলিতেছেন, বলে কি? কোথায় সাধু আর কোথায় গৃহস্থ! শুনে গা জ্বালা করছে। কোথায় সুমেরু পর্বত আর কোথায় সরষেদানা। কিংবা, যেন সাগর আর গোস্পদে জল। এইটুকুন মাত্র difference (পার্থক্য) — সাধু আর গৃহস্থে। নিন্দে না করে যদি তাঁদের সুখ্যাতি করতেন, কত উপকার হত লোকের। সাধুদের উপর যদি ভক্তি না হয় তা হলে ছাই হবে। সংসারী লোক উপদেশ দিতে গেলেই এই গোল করে। হক কথা বলবার উপায় নাই। তাহলে হয়তো কেউ আসবে না। যদি বলো এ-ও করো, ও-ও করো, তাহলে বেশ।

উনি সাধুদের গুণ দেখতে পেলেন না। এই যে কামিনীকাঞ্চন ছেড়ে

দাঁড়িয়েছেন, এর কি কোনই মূল্য নাই? যে কামিনীকাঞ্চনের কথায় মুখে লাল পড়ে, সাধুরা তা থেকে দুরে সরে দাঁড়িয়েছেন। এতে যে কতো শক্তি তা দেখতে পেলেন না। দেখলেন, কম্বল আর সোয়েটার। শরীরধারণ করতে হবে না? শীতে বস্ত্র দরকার। এ পরলেই সাধুত্ব চলে গেল? বিলাসিতা আর আবশ্যকতা — দু'টি জিনিস। কম্বল সোয়েটার আবশ্যক শরীরধারণের জন্য। তা ছাড়া সকলেই তো অবধূত সাধু নন। তা'তেও স্তর আছে! পোশাক দেখেই বিচার করা চলে কি? তাঁর ভিতরে কত গুণ তা দেখা উচিত।

পিতা-মাতা আত্মীয়-কুটুম্ব সব ছেড়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা কি সংসারে থাকতে পারতেন না! তাঁরা কি সংসারকে ফাঁকি দিয়ে এসেছেন! পারে কেউ করতে তা? করুক দেখি সংসারত্যাগ! এক বছর থাকুক দেখি তাদের মতই কম্বল সোয়েটার গায়ে দিয়ে! দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে নিজে। অপরের দোষ দেখা? একদিন স্ত্রীপুত্র কন্যা চোখের সামনে না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে যায় যে লোক, সেই লোকের মুখে সাধুর নিন্দা! থাক দেখি ভিক্ষা করে এক বছর। দেখবো কেমন বীর! এক পদ খাওয়া কম হলে বাড়িশুদ্ধ তোলপাড়। এইসব লোক যায় সাধুনিন্দা করতে! নিজে কলঙ্কসাগরে ডুবে আছে, আর অপরের কলঙ্ক দেখা। তাইতো ক্রাইস্ট বলেছিলেন, Why doest thou see the mote that is in thy neighbour's eye and seest not the beam that is in thy own eye — অপরের চোখে একটা তুচ্ছ কণামাত্র দেখছ, নিজের চোখের কড়িকাঠ দেখতে পাও না। চালুনি বলে ছুঁচকে, তোর কেন ছেঁদা।

সাধুরা যে সংসারের সুখ নিতে refuse (অস্বীকার) করেছেন এটা কি তাদের গুণ নয়? এর উপরের সুখ চাইছেন, ব্রহ্মানন্দ! সাধু হলেন বলে কি শরীরের needs (আবশ্যক দ্রব্য) নেবেন না? Minimum (সামান্যতম) নিচ্ছেন। তা'তে হয়ে গেল দোষ! ঈশ্বরের জন্য যে সর্বস্ব ছেড়েছেন, সেটা কি গুণ নয়? তার কি benefit (সুবিধা) society (সমাজ) পাচ্ছে না? একটি সাধুকে দেখলে কি মনে হয় না, ইনি ভগবানের জন্য সব ছেড়ে তাঁকে লাভ করবার জন্য প্রস্তুত? ধীরে ধীরে goal (লক্ষ্যে) পৌঁছুবেন। একজন্মে কি সকলের হয় — 'অনেক

জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং’ (গীতা ৬-৪৫)।

ঠাকুর বলতেন, দু’রকম মাছি আছে। এক রকম গুয়েতে বসে, আবার ফুলেতেও কখনও বসে। আর এক রকম কেবল ফুলেতে বসে। সাধুরা এই শেষ থাকের লোক — মৌমাছি। ফুলের মধু, অর্থাৎ ভগবানের আনন্দরস পান করেন। সংসারী লোক অপর থাকের মাছি। ঠাকুর পায়রার দৃষ্টান্তও দিতেন। সাধুরা পুরুষ পায়রা। ঠোঁটে ঠোঁট লাগালে টেনে নেবে। কিছুতেই ছুঁতে দেবে না। আর এক রকম আছে ঠোঁট লাগালেই একেবারে নেতিয়ে পড়ে। সংসারী লোক এইরকমের লোক। বেদে আছে নচিকেতার উপাখ্যান। কিছুরই বশ নয়। টাকাকড়ি, সুবর্ণ, অশ্বরথ, রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী, কিছুই নেবে না। কেবল চায় ব্রহ্মানন্দ। সাধুদের আদর্শ নচিকেতা — uncompromising (অদম্য) একেবারে uncompromising। যদি বল সাধুরা সকলে তো নচিকেতা নন্, বা শুকদেব। তার উত্তর — গৃহস্থেরাই কি সকলে জনক?

দুই রকম আছে, গুণগ্রাহী আর দোষগ্রাহী। হাঁস গুণগ্রাহী। জলে-দুধে মিশান আছে, দুধ নেবে জল ছেড়ে। আবার শূকর। পাঁচ রকম উত্তম জিনিস রেখে দাও সামনে — পলুয়া হালুয়া ক্ষীর রাবড়ী সন্দেশ — ও সব নেবে না। ঐখানে একটা লোক হাগছে, সে তাই খাবে, গু খাবে। ঐ ব্যক্তি অত খুঁজে তাঁদের গুণ পেল না। সবই দোষ। সংসারী লোক ধর্মবক্তা হলে ঐ রকম হয়। ছি ছি, ও রকম বলতে আছে? সংসারী লোক দাঁড়ায় কোথায়, সাধুর নিন্দা করলে? ঠাকুর বলতেন, নিত্য সাধুসঙ্গ দরকার। সাধুদের ঘড়ি right (ঠিক), সংসারীদের ঘড়ি wrong (ভুল)। তাই নিত্য wrong (ভুল) ঘড়ি right (ঠিক) ঘড়ির সঙ্গে মিলানো দরকার। তবে হুঁশ থাকে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। নইলে মনে হয়, আমার হয়ে গেছে। তার আর উন্নতি হবে কি? সর্বত্যাগের আদর্শকে মানতেই হবে, মর্যাদা দিতেই হবে। নইলে বুঝতে হবে নিচে পড়ে গেছে। তা নইলে ঈশ্বর কেন করলেন এই একটি স্বতন্ত্র থাক? ছি ছি, সাধুর নিন্দা! রাম রাম, এসব লোকের কথা শুনে মানুষ কি লাভ করবে? অনিষ্ট হবে। তার অপকার হবে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
৩০শে জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীঃ, ১৬ই মাঘ, ১৩৩২ সাল, শনিবার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু পালিয়ে যায় তাঁর দোহাইয়ে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ন চারিটা। একটি সাধু বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। আজ ১২ই নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। শ্রীম বসা চেয়ারে উত্তরাস্য। করজোড়ে প্রণাম করিয়া সাধু বসিলেন সামনে, শতরঞ্জী পাতা জোড়া বেঞ্চির উপর। তিনি প্রথমেই মহাপুরুষ মহারাজের সংবাদ লইতে লাগিলেন।

শ্রীম — হাঁ জগবন্ধু মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ আজকাল কি সব কথা ক'ন? তুমি কি নোট করছ?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। আমি ডায়েরীতে লিখে রাখি।

শ্রীম — কই, তোমার সঙ্গে ডায়েরী আছে?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ, আমি আপনাকে শোনাবো বলে এনেছি।

শ্রীম — পড়ুন তো।*

সাধু ডায়েরী পড়িতেছেন।

বেলুড় মঠ। ১৮ই অক্টোবর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। রাত্রি দুইটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত একটি সাধু শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে attend (দেখাশোনা) করেন। কি যন্ত্রণা! নিশ্বাস ফেলিতে যেন প্রাণ যায়। আর্তনাদের স্বর — হুঁ হুঁ হুঁ। সাধুটি ভাবিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও দুঃখ কষ্টের হাত থেকে পালাবার জো নাই।

শ্রীম — তা আর বলতে। ঠাকুর নিজে বলছেন, 'আমি অবতার'। কিন্তু কি ভোগটিই ভুগলেন প্রায় একবছর (ক্যান্সার)। ঘটি ঘটি রক্ত যাচ্ছে। খেতে পারছেন না কিছু। শুকিয়ে শরীর অস্থিচর্মসার হয়েছে।

কেন তাঁর এই ভোগ? তাঁর কি কর্মফলের ভোগ? নিজে বলেছেন

---

*সাধারণতঃ শ্রীম 'আপনি' প্রয়োগ করেন। অন্তর্মুখ অবস্থায় 'আপনি' 'তুমি' ভেদ লুপ্ত হয়।

আমি অবতার। সচ্চিদানন্দ এ শরীরে এসেছেন। তাঁর তো জন্ম কর্মফলে হয় নাই। দেখুন না, অবতার নিজে বলছেন। এত ভোগের ভিতরেও 'মা, মা' — অহর্নিশ এই বাণী কণ্ঠে। ভক্তদের অভয় দিয়ে বলছেন, 'তোদের বেশী কিছু করতে হবে না। কেবল আমি কে, আর তোরা কে, এই জানলেই হবে। আমাকে ধ্যান করলেই হবে।' বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য — জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ ভাব মহাভাব প্রেম সমাধি।'

আর একটা কথা। তবে তাঁর এ ভোগ কেন? এর উত্তর — ভক্তদের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। যদি তাই হয় তবে একেও ক্রুসিফিকশান্ (Crucifixion) বলা চলে। ক্রাইস্ট তো এই জন্য, ভক্তের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য ক্রুসবিদ্ধ হয়েছিলেন। এতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি? না, এই শরীর থাকলে সুখ দুঃখ থাকবেই। অবতারও বাদ পড়েন না। কিন্তু এরই ভেতর পরম সুখের, ভগবানদর্শনের চেষ্টা করতে হবে। এই শিক্ষা দেবার জন্য পলে পলে তিলে তিলে নিজে একদিকে যেমন ভুগলেন, অন্যদিকে তেমনি মুহুর্মুহু সমাধি। এ দু'টি extreme (চরম সীমা) — অত্যন্ত ভোগ ও অত্যন্ত ভোগনিবৃত্তি বস্তু কি, তা দেখালেন। তবে তো ভক্তগণ সুখদুঃখের আবর্তে উদ্বেলিত হয়েও পরমসুখ যে ভগবান, তাঁকে ধরে থাকতে চেষ্টা করবে।

ডায়েরীর পাঠ চলিতেছে।

তার পরদিন ১৯শে অক্টোবর ১৯২৯, শনিবার। সকাল সাড়ে ছয়টা। গত রাত্রে অত কষ্ট, কিন্তু সকালে প্রণামের সময় সোজা হইয়া বসিয়া কথা কহিতেছেন হাসিমুখে — যেন কিছুই হয় নাই। সাধুরা একে একে আসিয়া প্রণাম করিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন সহাস্যে। সাধুটি ভাবিতেছেন, বাবা, এ যেন বহুরূপীর জাত — ব্রহ্মজ্ঞগণ। গতরাত্রে কত যন্ত্রণা — সকালে যেন কিছুই হয় নাই ভাব। একেই বুঝি বিদেহী বলে।

শ্রীম — তাই তো ঈশ্বরের শক্তি না হলে প্রচারকার্য চলে না। অবতারে যেমন দু'টি ভাব — অত্যন্ত দুঃখ ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি —

প্রায় একই সময়, তাঁর পার্ষদদেরও প্রায় তদ্রূপ। তাই ঈশ্বরশক্তির অবতরণ জগতে — balance (সমতা) রাখবার জন্য।

(পাঠকের প্রতি) — হাঁ, পড়ুন তো।

পাঠক ডায়েরী পড়িতেছেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ আসিয়াছেন মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিতে সারগাছি আশ্রম হইতে। তিনিও ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হইতেছে। পাশে সাধুটি দাঁড়ান। মহাপুরুষ মহারাজ (সাধুকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, এ আগে মাস্টার মশায়ের কাছে ছিল। তারপর মাদ্রাজে পাঠান হয়েছিল। অনেকদিন ছিল। আবার উটিতেও ছিল। ওরা এনেছে — ঢাকায়, না কোথায় পাঠাবে। (সাধুর প্রতি) কোথায়? সাধু বলিলেন, লক্ষ্ণৌ। মহাপুরুষ বুঝিতে পারিলেন না। আবার সাধু জোরে বলিলেন, লক্ষ্ণৌ। মহাপুরুষ বলিলেন, ঢাকায় না? সাধু বলিলেন, আজ্ঞে না, লক্ষ্ণৌ।

পাঠ চলিতেছে।

আজ ২১শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ। সকাল সাড়ে ছয়টা। বেলুড় মঠ। উপরের বারান্দা। শ্রীমহাপুরুষ বসিয়া আছেন চেয়ারে, ছোট ঘরের দরজার পাশে। সামনে গঙ্গা। ডান হাতে স্বামীজীর ঘর। স্বামীজীর ঘরের উত্তরের দরজা দিয়া ও দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া নিচে চন্দন গাছ দেখা যাইতেছে। মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া সাধুরা চলিয়া যাইতেছেন। স্বামী শাশ্বতানন্দ, আমেরিকান প্রশান্ত ও জগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন পাশে। মহাপুরুষ সহাস্যে বলিতেছেন, কতকগুলি butterfly (প্রজাপতি) ওখানে বেড়াচ্ছে — ভারি romantic (ভাবপ্রবণ) — ঐ চন্দনগাছে। ওরা যেখানে ভাল গন্ধ, যেখানে যা ভাল দেখবে সেখানেই যাবে। চন্দনের ফুল ভারি সুগন্ধ। তাই ওখান থেকে নড়বে না (হাস্য)। এই বলিয়া মহাপুরুষ মহারাজ তাহাদের কথায় খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন।

শ্রীম — এই রকম মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয় বিষয়ে — স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন, নামযশ — এ সবে। কিন্তু তাঁকে ধরে সংসার করলে ভয় নেই ততটা, ঠাকুর বলতেন। কিন্তু মহামায়া সব ভুলিয়া দেয়। তাই ঠাকুর উপায়ও বলে গেছেন, নিত্য সাধুসঙ্গ চাই। ভক্তি লাভ করে সংসার করলেই অনেকটা রক্ষে।

২

সাধু আবার ডায়েরী-পাঠ করিতেছেন।

২২শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। বিকাল তিনটা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরে বসিয়াছেন দোরগোড়ায় ইজি-চেয়ারে। সামনে মেঝেতে বসা দেরাদুনের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, দাড়িওয়ালা বাইরের একজন ভক্ত সাধু আর একজন লোকও আছে। একটি সাধু সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ অপর লোকদের বলিতেছেন, তিনি অন্তরাত্মা। তাঁর যদি একই আভাস হৃদয়ে হয়ে যায় তবে জ্ঞান ভক্তি সব আপনিই আসে। একটি লোক বলিতেছে, একটি ছাব্বিশ বছরের যুবকের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — বা, তা হলেই তো হলো।

পরদিন বুধবার, ২৩শে অক্টোবর। সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ আজ নিজের খাটে বসা উত্তর দিকে, পশ্চিমাস্য। গায়ে গেঞ্জি। তাহার উপর লাল জরিদার মাদ্রাজী গেরুয়া চাদর জড়ান। সামনে গড়গড়া, সোনালী নল দিয়া তামাক খাইতেছেন। মন অন্তর্মুখীন। সেবক পাশে দাঁড়ান। কয়েকবার হুঁকায় টান দিয়া বলিতেছেন আপন মনে, শ্রীগুরু শ্রীগুরু শ্রীগুরু। খানিক বাদে আবার বলিতেছেন, সচ্চিদানন্দ। মন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। যন্ত্রের মত হুঁকার নলে মুখ লগ্ন। একটি সাধু মেঝেতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষের মন নিচে নামিয়া আসিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভাল আছ? কি করুণামাখা স্বর! মনটি বুঝি ঐ সচ্চিদানন্দ-রসে রসালো। তাই কি এই মাধুর্য, এই করুণা? কথা তো দুইটি — কিন্তু ঐ দুইটি কথাই যেন ভাসিয়া আসিতেছে রসসাগরের ভিতর হইতে।

শ্রীম — তা আর বলতে!

পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৪শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। সকাল সওয়া ছয়টা। বেলুড় মঠের উপরের বারান্দা। শ্রীমহাপুরুষ টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন মধ্যখানে। রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। পতিতপাবনী সম্মুখে প্রবাহিতা। মহাপুরুষের গায়ে বুককাটা গেঞ্জি। চারটি বোতাম লগান। গলায় জড়ান লাল জরিদার মাদ্রাজী গেরুয়া চাদর। একটি সাধু গঙ্গা স্পর্শ করিয়া উপরে উঠিতেছেন। সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া দর্শন

করিলেন মহাপুরুষ মহারাজকে। স্বামী ওঁকারানন্দ দাঁতন করিতেছেন পোস্তায় দাঁড়াইয়া।

এখন সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষের নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন ইজি-চেয়ারে দরজার পাশে। মহাপুরুষের পিছনে বন্ধ দরজা অন্য ঘরের। উত্তরে খাট। মহাপুরুষের ঘরে দক্ষিণে একটি বড় ট্রাঙ্ক। তাহার উপরে কাপড়চোপড়, সব নূতন। ট্রাঙ্কের পশ্চিমে, ঘরে প্রবেশের দরজা। দরজার পশ্চিম পাশেও ট্রাঙ্কের উপর কাপড়চোপড়। তাহার পশ্চিমে টেবিল। তাহার উপর একটি স্টোভ, কয়েকটা ডালিম ও খাদ্য দ্রব্য, ঔষধাদি রহিয়াছে। সাধুরা সব প্রণাম করিতে আসিতেছেন। স্বামী ওঁকারানন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া প্রবেশ-দরজার পূর্বপাশে দাঁড়াইলেন, মহাপুরুষ মহারাজের বাঁ হাতে। স্বামী গঙ্গেশানন্দ শ্রীমহাপুরুষের সেক্রেটারী। তিনি দাঁড়াইয়াছেন ঘরের ভিতর দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার সামনে। একটি সাধু আসিয়া হঠাৎ প্রণাম করিতেছেন ভূমিষ্ঠ হইয়া। মহাপুরুষ মহারাজ প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? ওঁকারানন্দ বলিলেন, আনন্দ। সাধু প্রণাম করিয়া উঠিতেই সহাস্যে বলিতেছেন, ওর মাথাটার formation (আকৃতি) একটু অন্য রকম। স্বামী ওঁকারানন্দ বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। এতক্ষণে সাধু উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে পশ্চিম দিকে দাঁড়াইলেন, ওঁকারানন্দের বিপরীত দিকে। মহাপুরুষ আবার বলিলেন, আমরা বলি ‘তে-এইটে’। সকলে নীরব।

সাধুটি কি ভাবিলেন, হয়তো খারাপ লক্ষণ। আবার কি ভাবিলেন, তা হলেই বা, তাঁর ছেলে বটে তো। আর তাঁর পরম-মঙ্গলময় দৃষ্টি পড়েছে তো। ছেলেকে তো বাবা ছাড়তে পারবেন না। আর যখন দৃষ্টি পড়েছে তখন সকল অমঙ্গল দূর হল। সাধুটি কি এইরূপ ভাবিতেছেন? শ্রীমহাপুরুষ সস্নেহে বলিলেন — বাবা, ভাল আছ? কথায় যেন অমৃত ঝরে। সাধুর হৃদয় প্রেমপূর্ণ। সাধুর মনে কষ্ট না হয় তাই-বুঝি এই অমৃতবর্ষণ।

স্বামী শর্বানন্দ ও নির্বাণানন্দ আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা গিয়া দাঁড়াইলেন ঘরের ভিতর। তাঁহাদের পিছনে দেয়াল। শর্বানন্দ বলিলেন, বরানগর অরফানেজে ক্লাস হবে worker-দের (কর্মীদের) ভিতর। অদ্বৈতের পশুপতি (স্বামী বিজয়ানন্দ) নেবে জেনারেল ক্লাস। আর মাদ্রাজের

সুরেশ (স্বামী শাশ্বতানন্দ) নেবে শাঙ্কর ভাষ্য গীতা।

শ্রীমহাপুরুষ — শঙ্করভাষ্য কে বুঝবে? তবে মূলটা পড়লে ভক্তি, কর্ম, এগুলি clear (স্পষ্ট) হয়।

শর্বানন্দ — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ — এই controversy (বাদানুবাদ) পড়ে কি হয়?

খানিক নীরবতার পর মহাপুরুষ আবার কথা কহিতেছেন, বেদান্তভাষ্য দিল্লীকা লাড্ডু। ছেলেবেলা মনে করতুম, বুঝি না পড়লে নয়। পড়া গেল। এখন দেখছি ধোঁকার টাটি।

একশ' ভাষ্য-টীকাতেও যা clear (স্পষ্ট) না হয়েছে তা তাঁর (ঠাকুরের) এক একটা কথায় হয়ে গেছে। (খানিক নীরবতার পর) 'সব এঁটো হয়েছে, ব্রহ্ম এঁটো হয় নাই', এই একটি কথা — কি সুন্দর!

শর্বানন্দ — একটা intellectual (জ্ঞানের) বাসনা থাকে। শাস্ত্র পড়ায় এটা শেষ হয়ে যায়। বৃহদারণ্যকে আছে — 'পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্য বাল্যে তিষ্ঠাসীৎ', পড়ে শুনে শেষে বালক হয়ে যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, সব সময় তো আর (চোখ বুজার অভিনয় করিয়া) চোখ বুজে থাকতে পারে না। কিই বা করে?

স্বামী ওঁকারানন্দের গায়ে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবী। তাই শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাকে একটা নূতন জামা করিতে বলিতেছেন। স্নেহভরে বলিতেছেন, জামাটা ছিঁড়ে গেছে। আর একটা নূতন জামা করিয়ে ন্যাও। এখান থেকেই খরচা দেওয়া হবে।

স্বামী শর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন — মহারাজ, আপনার শরীর কেমন? শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, ভালয় মন্দয় চলে যাচ্ছে। কার্তিক মাসের হিম বড় খারাপ। কিছুদিন পর একটু পাকলে তখন এতো অসুখ করবে না। এখন যে হিম লাগাবে ধড়াস ধড়াস করে পড়ে যাবে। এখনকার রোদ তত খারাপ নয়, হেমন্তের রোদ।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জলখাবার আসায় সকলে বাহির হইয়া গেলেন।

অপরাহ্ণ পৌনে ছয়টা।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ পাশের ছোট ঘরে স্বামী গঙ্গেশানন্দের খাটে বসিয়া জলযোগ করিতেছেন।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৫শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। গঙ্গার দিকের উপরের বারান্দা। স্বামী অখণ্ডানন্দ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন স্বামীজীর ঘরের পাশে উত্তরাস্য। স্বামী নির্বাণানন্দ ইজি-চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী শর্বানন্দ গঙ্গার দিকের রেলিং-এ পিছন দিয়া পশ্চিমাস্য দাঁড়ান। জগবন্ধু প্যাসেজের (পথের) মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ইনি স্বামীজীর ঘরের সেবক। শ্রীমহাপুরুষ বারান্দায় উত্তর-দক্ষিণে বেড়াইতেছেন টলিতে টলিতে। কখনও ইজি-চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলিতেছেন। গায়ে কটা রঙ্গের ফ্লানেলের জামা। পরিব্রাজক অবস্থায় যেরূপ কথাবার্তা হইত ঐরূপ কথা দুই চারিটা হইতেছে। আর উভয়ে হাসিতেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিতেছেন, আমাদের মধ্যে ইনি — দাদাই, বেশ ভাল হিন্দী বলতে পারতেন।

ডায়েরী পাঠ আজের মত শেষ হইল। সাধু মিষ্টিমুখের পর শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বেলুড় মঠে চলিয়া গেলেন।

৩

মর্টন স্কুল। চারতলা, সিঁড়ির ঘর। ১৩ই নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসা। এখন রাত্রি সাতটা, সম্মুখে যুগ্ম বেঞ্চিতে বসা সীতাপতি মহারাজ ও জগবন্ধু মহারাজ। জগবন্ধু মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে, দুর্গাপদ মিত্রও (হিলিং বাম) আসিয়াছেন। ঈশ্বরীয় কথা চলিতেছে।

একজন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — ঠাকুর বলেছেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবে। আমরা দশজন নিয়ে থাকি। শহরে নির্জনতা পাব কোথায়?

শ্রীম (সহাস্যে) — হ্যাঁ। স্বামীজী তাঁর 'প্রলয় সমাধি'তে বলেছেন, 'ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল'। তখন বহে মাত্র 'আমি আমি'। তারপর বলছেন, 'সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিশাইল — অবাংমনসগোচরং বোঝে প্রাণ বোঝে যার।' সত্যিকার নির্জনতা ঐ জায়গায় - প্রলয় সমাধিতে। এর পূর্বে ঠিক ঠিক নির্জনতা নাই। তবে ঐ নির্জনতার

অধিকারী ক’জন? Relative (আপেক্ষিক) নির্জনতার কথাই ঠাকুর বলছেন। রাত দু’টোর সময় তো নির্জন! তখন করে না কেন? তখন কেবল ভোঁস ভোঁস করে ঘুমায়। বাবুরা complain (অভিযোগ) করে কি করে? আশ্চর্য! ঢিমে তেতালার কাজ নয়। সশস্ত্র সৈনিকের মত হবে। সর্বদা সঙ্গীন চড়িয়ে আছে — কখন শত্রু আসে কোন দিক থেকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটান, আর আবোল তাবোল করে দিন কাটান। তা করলে হবে কি করে? এরই ভেতর সব করতে হবে। একটা life-এ (জীবনে) দশটা life-এর (জীবনের) কাজ করতে হবে। তবে হয়। লক্ষ্মণ বার বছর ঘুমোন নাই, ফলমূল আহার আর অটুট ব্রহ্মচর্য! তবে অত বড় কাজ হয়েছে মেঘনাদবধ, রাবণবধ। ভক্তদের আবার অবসরের অভাব কোথায়? সারা দিন রাত পড়ে আছে। রাত্রিটার utilize (সদ্ব্যবহার) করতে পারে। ঠাকুর ভক্তদের বলে দিতেন, রাত তিনটায় উঠে ধ্যান করবে। দিনে কাজ করতে হয় কি না! Be up and doing (উঠে পড়ে লাগো)। Warfield-এ (রণাঙ্গনে) দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় অবসর কোথায় ঘুমুবার? চার দিকে শত্রু। অন্তরে বাইরে শত্রু। ঘোর নিষ্ঠুর রিপু শিয়রে দাঁড়িয়ে। ওঠ, ওঠ, তাঁর দোহাই দিয়ে অস্ত্রধারণ কর। তবে শত্রু পালাবে। মৃত্যু পর্যন্ত পালিয়ে যায় তাঁর দোহাই দিলে! প্রার্থনা আর শরণাগতি — এই উপায়। খালি কেঁদে কেঁদে বল — মা রক্ষা কর, রক্ষা কর মা!

সীতাপতি মহারাজ — দিনে কাজ, রাতে ভজন — মানুষ তবে ঘুমোয় কখন?

শ্রীম — (সহাস্য) — হ্যাঁ, ঐ একটা puzzling question (গোলমেলে প্রশ্ন) বটে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটু ভাগবত পাঠ করলে হয়। রাসের দুই একদিন বাকী আছে। রাসপঞ্চাধ্যায় পড়া হোক।

একজন ভক্ত পড়িতেছেন। প্রথম তিনটা অধ্যায় পড়া হইতেছে (২৯-৩১)। পাঠক অধ্যায়ের নাম পড়েন নাই এবং শেষও পড়েন নাই। তাই শ্রীম বলছেন — ও পড়বে। ওগুলি হলো mile stone (ধারাবাহিক ধাপ)। একত্রিশ অধ্যায়, গোপীগীতা। তাহার পাঠ চলিতেছে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলে তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া গুণকীর্তন

করিতেছেন। পাঠক পড়িতেছেন —

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥

শ্রীম একেবারে স্থির। নয়ন অপলক, মুখমণ্ডল আরক্তিম, নয়নকোণ বহিয়া প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে।

ভগবানের কথামৃত যে সংসারতপ্ত জীবগণের প্রাণদাতা, ইহা শ্রীম-র নিজের অনুভব। নিজে নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন ঠাকুরের কথামৃত শ্রবণে। সারাজীবন ধরিয়া অপরকেও এই কথামৃত তিনি বর্ষণ করিয়াছেন অকাতরে। তাই স্বরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র প্রারম্ভেই এই মহামন্ত্র পাঠের বিধি করিয়াছেন।

উপস্থিত শ্রোতাগণের ভিতর একজন বয়োবৃদ্ধ সমালোচক আছেন। গোপীগণের আচরণ সমাজধর্ম বিগর্হিত—পাছে ভক্তের মনে এই ভাব উদয় হয়, তাই শ্রীম নিজেই ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন।

শ্রীম ঐ ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন অতি মধুর কণ্ঠে, ওতে criticise (সমালোচনা) করা চলবে না — যেকালে আমাদের superior-রা (গুরুগণ) বলে গেছেন উহা সত্য — চৈতন্যদেব, ঠাকুর এঁরা। চৈতন্যদেবের life-টিই (জীবনটিই) হলো রাসলীলার key (ভাষ্য)। অনন্ত প্রেমসমুদ্রের কতকগুলি বৃহৎ বুদবুদ্ গোপীগণ। শ্রীরাধা তাঁদের ভিতর বড়। দেহবুদ্ধি থাকলে এ লীলা বোঝা যায় না। চৈতন্যদেব শ্রীরাধার ভাবে শেষ বার বছর কাটিয়েছেন — মহাভাবে। ঠাকুরের এই মহাভাব মুহুর্মুহুঃ হত। ব্রাহ্মণী প্রথম উহা ধরেন। তাই সভা করে প্রচার করেন, ঠাকুর অবতার। গোপীদের নাম হলেই ঠাকুর মাথা নিচু করে প্রণাম করতেন। বলতেন, গোপীগণের প্রেমের এককণা কারো হলে হেউ ঢেউ হয়ে যায়। উপনিষদে আছে, দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণই গোপী হয়েছিলেন। এসব প্রেমলীলা বোঝা বাবুদের কর্ম নয়। ভগবানের কৃপায় যদি মনটি একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়, সম্পূর্ণরূপ কামগন্ধহীন হয়, তবে এর আভাস পাওয়া যায়।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৩ই নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

তৃতীয় অধ্যায়

ঠাকুর জীবন্ত, সত্যই জীবন্ত

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। আজ ২৯শে নভেম্বর, ১৯২৯ ক্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। ভক্তরা ছাদে বসিয়া আছেন। শ্রীম ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। বেলুড় মঠ হইতে জগবন্ধু মহারাজ আসিয়াছেন। তিনিও শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পৌনে ছয়টায় শ্রীম ছাদে আসিলেন। কিছুক্ষণ কথা কহিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। সাড়ে ছয়টায় আবার বাহিরে আসিলেন। সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। শরীর তত ভাল নয়। চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াই কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (তর্জনী দিয়া গোল করিয়া বৃত্ত আঁকিয়া) — wonderful (চমৎকার) এই সৃষ্টিটা।

বালিশ ভাসছে সমুদ্রে। ভিতরেও নোনা জল, বাইরেও!

কিন্তু, এই dunghill (গোবরের গাদা) থেকেই lotus flower (পদ্মফুল) ফোটে।

আজ আর বেশী কথা কহিলেন না। বলিলেন, অধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়া হোক। উত্তর কাণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ হইল।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — ডায়েরী এনেছেন?

জগবন্ধু — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম — পড়ুন তো গত দিনের বিবরণ।

জগবন্ধু পড়িতেছেন।

বেলুড় মঠ। সকাল সাতটা। আজ রাসপূর্ণিমা ১৬ই নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। ৩০শে কার্তিক, ১৩৩৫ সাল।

মঠাধ্যক্ষ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ আপন দ্বিতল কক্ষ হইতে দক্ষিণ দরজা দিয়া বাহির হইলেন। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, মুণ্ডিত মস্তক। গায়ে একটা

লম্বাহাতা গরম গেঞ্জি। বয়স পঁচাত্তর। ইদানীং কিছুকাল হইতে একটু হাঁফানির ভাব দেখা দিয়াছে। চলিবার সময় শরীরটা সম্মুখে একটু হেলিয়া পড়ে। লাল ভেলভেটের চটি পায়ে — ছেঁচড়াইয়া চলিতেছেন। বাম হাতে খোকামহারাজের ঘর। ডান হাতে সিঁড়ির গায়ের রেলিং।

সিঁড়ির দক্ষিণের ঘর হইতে বাহির হইলেন মঠের উপাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি আশ্রমে থাকেন। ইনিই উহার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি দীর্ঘকাল ওখানে রহিয়াছেন। মাঝে মাঝে মঠ ও কলিকাতায় আসেন। এখন কয়দিন মঠে আছেন, মঠগৃহের দক্ষিণের কক্ষে বাস করিতেছেন। ইনি আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন 'দাদা' মহাপুরুষ ধীরে ধীরে এদিকে আসিতেছেন। তাই সিঁড়ির উপরের চাতালে গঙ্গার দিকের বারান্দায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয় গুরুভ্রাতারই সহাস্য বদন।

শ্রীমহাপুরুষ সহাস্যে আনন্দের সহিত বলিলেন, ওঁ নমো নারায়ণায় — বালস্বামী নমো নারায়ণায়। স্বামী অখণ্ডানন্দ বয়সে কনিষ্ঠ। তিনি যুক্তকরে মৌন প্রতি-নমস্কার করিলেন। গুরুভ্রাতাগণ স্বামী অখণ্ডানন্দকে বয়স কম বলিয়া যৌবনাবস্থা হইতেই আহ্লাদ করিয়া 'বালস্বামী' বলিতেন। ইনি আবার বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও পরিব্রাজকজীবনে সকল গুরুভ্রাতার জ্যেষ্ঠ। অতি অল্প বয়সে ইনি তিব্বত ভ্রমণ করেন।

শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, আজ গোবিন্দের রাস। স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিলেন, তা হলে আজ যাব না। শ্রীমহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়? স্বামী অখণ্ডানন্দ উত্তর করিলেন, কলকাতায় জামার মাপ দিতে।

দুই গুরুভ্রাতা শ্রীমহাপুরুষের ঘরে উপবিষ্ট। ঘরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান। তিনটি দরজা। পূর্বের দরজা দিয়া গেলে 'শ্রীমহারাজে'র (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) ঘরে যাওয়া যায়। তারপর গঙ্গার সামনেই বারান্দা — সম্মুখে পতিতপাবনী জাহ্নবী। উত্তরের দরজা দিয়া ছাদে যায়। আজ দক্ষিণের দরজা দিয়াই সকলে গৃহে প্রবেশ করেন। ঘরটি উত্তর-পশ্চিম কোণে। দক্ষিণের দরজার পশ্চিম দিকে একটি জানালা। তাহার সামনে একটি টেবিল। তাহাতে থাকে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। পশ্চিমের দেয়ালে আছে দুইটি জানালা। উত্তরের জানালাটি দিয়া শ্রীমহাপুরুষ শ্রীশ্রী ঠাকুরঘর

দর্শন করেন বিছানায় বসিয়া। দুই জানালার মাঝে দেয়ালের গায়ে একটি টেবিল আছে। তাহাতে পুস্তক, চিঠিপত্র লিখিবার সরঞ্জাম থাকে। উত্তর দেয়ালের গায়ে আলমারী। তাহাতেও পুস্তক, কাপড় চোপড়। লিখিবার টেবিলের সামনে একটি চেয়ার। তাহাতে মহাপুরুষ বসেন দক্ষিণাস্য। কেহ আসিলে এখানে বসিয়া কথা বলেন। এই চেয়ারের বাম দিকে পূর্ব দেয়াল। তাহার পশ্চিম পাশে শয়নখাট। তাহাতে মশারী খাটাইবার জন্য চারিটি ডাণ্ডা লাগান। ডাণ্ডার মাথায় চারিটি কাষ্ঠের একটি সংযুক্ত ফ্রেম। মহাপুরুষের ঘরের উত্তর দিকে একটি কাঠের ছোট সিঁড়ি আছে — দুই ফুট হইবে। উহা বাহিয়া ছাদে যান। ছাদের উত্তর পার্শ্বে বাথরুম। দক্ষিণের দরজার বাম পাশে একটি ইজি চেয়ার। তাহাতে কালো কুশান। দরজার বাইরে ডান হাতে একটি মিটসেফ। তাহাতে মিষ্টান্নাদি থকে। কেহ আসিলে প্রসাদ দেওয়া হয়। তাহার পাশেই হুঁকা কলিকা চিমটা প্রভৃতি তামাকের সরঞ্জাম। শ্রীমহাপুরুষ তামাক সেবন করেন।

গৃহমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ ইজি-চেয়ারে বসা, পশ্চিমাস্য। আর শ্রীমহাপুরুষ বসিয়া আছেন টেবিলের সামনে চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। সাধুরা কেহ ঘরে, কেহ বা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ মহাপুরুষের খাটের ডাণ্ডা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন উত্তর দিকে। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দের সহিত কথা কহিতেছেন।

অখণ্ডানন্দ — চল, তুমি হোমিওপ্যাথিক জান। কত কাজ হবে। তা যেতে চায় না। ধরি মাছ না ছুঁই পানি — এই ভাব। মঠে রয়েছে, যতদিন ভাল লাগে থাকবে। নয়তো চলে যাবে। আরে, ও-ও তপস্যা। স্বামীজী বলেছেন, 'জলে ঝাঁপ দেবে, আগুনে পুড়বে।' মানুষের শরীর ধরে ভগবান আসেন। তাঁর মানুষে বেশী প্রকাশ। মানুষেই এবার তাঁর পূজা হবে ভাল।

মন না বসলেই ঘোরে। গুরুবাক্যও মানতে চায় না। মহিমানন্দও আর একজন আছে। হরি মহারাজের দেহ যাবার সময় দেখলাম পঞ্চক্রোশ কাশী ছেড়ে কোথাও যাবে না, যদি হয়ে যায়।

মহাপুরুষ — এবার এসেছিল। তা সেই ভাব অনেকটা কমেছে। এখন অনেক wide view (উদার ভাব) হয়েছে। ঠাকুরের ওপর যাদের

বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে, তাদের আবার সঙ্কীর্ণতা কেন? যেখানেই থাকুক তারা নিশ্চিন্ত।

আজ শ্রীকৃষ্ণের রাস। 'জয় গোবিন্দ, জয় ব্রজবন্ধু' বলিয়া সুর করিয়া হাততালি দিয়া গান গাহিতে লাগিলেন।

শ্রীম স্থির হইয়া ডায়েরী পাঠ শুনিতেছেন। আর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, আহা কি অমৃত পরিবেশন করলেন আপনি! সব যেন বৈকুণ্ঠের সংবাদ।

২

পাঠক ডায়েরী পাঠ করিতেছেন।

আজ ২১শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

বেলুড় মঠ। এখন সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা। দোতলার বারান্দা। শ্রীমহাপুরুষ, স্বামী শিবানন্দ, চেয়ারে বসিয়া আছেন। গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। অল্প শীত পড়িয়াছে। শরীর একটি র‍্যাপারে ঢাকা। অন্তর্মুখীন ভাব। একজন সাধু সেবক একটা গামছা দিয়া মাঝে মাঝে মশা তাড়াইতেছেন। বেশ প্রশান্ত গম্ভীর দর্শন। মুখমণ্ডলে করুণার ছাপ।

খোকা মহারাজ ঘরের বাহিরে দক্ষিণ দিকে বসা। তাহার দক্ষিণে বারান্দায় আসিবার রাস্তা। তাহার দক্ষিণে স্বামীজীর ঘর।

একটি যুবক ভক্তের প্রবেশ। ভক্ত প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছেন। আর করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি আশীর্বাদ করুন — আমার জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস লাভ হোক, বিবেক বৈরাগ্য লাভ হোক। স্বামীজী যেমন মার কাছে অন্য কিছু চাইতে পারলেন না, আমিও তেমনি অন্য কিছু চাই না।

একজন সাধু স্বামীজীর ঘরে বসিয়া এই দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। তিনি স্বামীজীর টেবিলের পূর্ব-উত্তর কোণে বসা। তাহার পিছনে পূর্ব দেয়াল। তাঁহাকে বারান্দা হইতে দেখা যায় না। ইনি স্বামীজীর ঘরের সেবক। যুবকের মুখে স্বামীজীর প্রার্থনার কথা শুনিয়া সাধুর একটু উপহাসের ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু শ্রীমহাপুরুষের করুণামাখা স্বর শুনিয়া, আর যুবকের কথায় বালকের মত সহজ সহানুভূতির ভাব দেখিয়া, নিজে দুঃখিত

হইলেন উপহাসের জন্য।

শ্রীমহাপুরুষ করুণা ও সহানুভূতির সহিত উত্তর করিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো চাইতে হয় — জ্ঞানভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য। এই সবই তাঁর মায়া — আমার বাড়িঘর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পরিবার। আমার মঠ — এও মায়া। এ সবই মায়া। সব তোমার, আমার নয় — এই জ্ঞান।

যেখানে অনেক লোক একত্র হয়ে একটা কাজ করছে (সম্ভবত মঠ ও মিশন লক্ষ্য করে বলছেন) তা তাঁর মহামায়াতেই করছে।

এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, একজন যাচ্ছে তো অন্য জন আসছে। কর্ম চলে যাচ্ছে। তার এক গভর্নমেন্ট চলে গেলে আর একটা আসবে। এই অনন্ত প্রবাহ চলছে।

ভক্ত — যেমন নদীর স্রোত! নদী দেখতে একই, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে।

মহাপুরুষ — হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই অনন্ত প্রবাহ লোককে ভুলিয়ে দিচ্ছে। মানুষের স্বতন্ত্র একটা ভাব আছে, সকলেরই। ভগবানকে যে ডাকতে হবে — এই উদ্দেশ্য থেকে সবাইকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। এই তাঁর মায়া।

স্বামীজীর ঘরে বসিয়া সাধু ধ্যান করিতেছেন এই চিত্রটি।

মহাপুরুষ — অনন্ত সংসারপ্রবাহ। বাড়িঘর মানুষ জীবজন্তু জন্মাচ্ছে। দু'দিন খেলছে আবার মরছে। পাহাড় পর্বত বন নদী সাগর — হচ্ছে, আর যাচ্ছে। যেখানে পাহাড়, সেখানে হচ্ছে সাগর। আবার সাগর হচ্ছে সাহারা মরু। সব আসছে যাচ্ছে, যেন বায়োস্কোপের চিত্র।

এই প্রবাহ চলছে চিরকাল। কেউ এর গতি রোধ করতে পারছে না। ভগবান যখন মানুষরূপে অবতীর্ণ হন, তখনই কেবল কতকগুলি লোক ব্যাকুল হয় এই প্রবাহের উল্টো দিকে যেতে, আর চেষ্টা করে।

আমাদের মিশনও ঐ কর্মস্রোতে চলেছে। আমিও চলছি। কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠছে এই ভেবে — অত শুনলুম দেখলুম, এই সব কি এমনি যাবে!

আবার দেখছি, অনেকে এই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। তাদের হয়তো ঈশ্বর দেখবেন। হয়তো তাদের বিশ্বাস বেশী।

আবার বিশ্বাস না করেও যারা গড্ডলিকা প্রবাহের মত গা ভাসিয়ে দিয়েছে তাদেরও তিনিই দেখবেন। কেন না, স্বামীজী বলেছেন, সব মহৎ লোক এখানে এসেছে।

আমি তবে কি প্রবাহ (মিশনের) থেকে সরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চলবো? তখন আবার আসে ভয়। মনে হয় — পারবো কি একা যেতে? বুঝলাম তো, উদ্দেশ্য — তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া। একবার চেষ্টা করে তো পারি নাই। ভিতর থেকে কাজ করবার আদেশ হয়েছে। আর ভরসাও তো পেয়েছি — কোলের ছেলে কোলে যাবেই তো। বাপের একটু কাজ কর। বাপ—ঠাকুর তো দেখছেনই।

স্রোতে গা ভাসিয়ে অর্থাৎ কর্মে ডুবে মাঝে মাঝে তাঁকে স্মরণ করা, এও তো কেমন অস্বস্তি আর চঞ্চলতা।

আবার balance (সমতা), কাজের ও তাঁকে স্মরণ রাখার, তা-ও তো সব সময় হয় না। কাজের ভিড়ে সব তলিয়ে যায়। তবে যদি নিজের ধাত মত কাজ হয় তবে তাকে ভোলার chance (সুযোগ) কম। করা কি?

এই চিত্তবিক্ষেপে অধীর হইয়া সাধু অসহায়ের মতো প্রার্থনা করিতেছেন — 'প্রভো, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না। কর্ম কমিয়ে দাও। শরণাগত।'

শ্রীম — আহা, কি সুন্দর করে অন্তরের চিত্রটি এঁকেছেন উনি। ভেতরের সংগ্রামই জীবন্ত ধর্মজীবনের চিহ্ন। যারা ডায়েরী রাখে তাদের সংগ্রামের ছবিগুলি অপরের খুব উপকার করে। সাধকের ভেতরের সংগ্রামের ছবি খুব কম লোক রাখে। বেশীর ভাগ শাস্ত্রই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ। এই ডায়েরীতে সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ২ ২শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। আরতি শেষ হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে গঙ্গা। ওপারের বিদ্যুতের আলো মালার মত ঝুলিতেছে। মহাপুরুষ মহারাজের পাদমূলে বসিয়া আছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ইনি দেরাদুনের নিকটবর্তী রাজপুরে থাকিয়া সাধন ভজন করেন। সাধুর

মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়ি। ইনি শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপা লাভ করিয়াছেন কাশীতে কিছুকাল পূর্বে। ইদানীং দর্শনমানসে কয়েকদিন হইল মঠে আছেন।

আলো আঁধারে শ্রীমহাপুরুষ উপবিষ্ট! কি প্রশান্ত মুখমণ্ডল! দরজার উত্তর পাশে তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার ডান দিকে স্বামীজীর ঘরের উত্তর দেয়ালের কাছে একটি সাধু মহারাজকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুরঘরে আরতির সম্মিলিত ধ্বনি মহাপুরুষ মহারাজের মন টানিয়া রাখিয়াছে। বুঝি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মসাগরে মগ্ন। এই প্রশান্ত আনন্দময় ভাব সাধুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন, কি ভাগ্য আমার! সম্মুখে এই বেদপুরুষকে দর্শন করিতেছি। তিনি যুগাবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ — ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। আমার গুরু, ঈশ্বর। মাদ্রাজ মঠে নিবাসকালে সাধুর মনে যে ভাব উঠিয়াছিল — ইনিই এখন রামকৃষ্ণময় শ্রীরামকৃষ্ণ । আজও যেন তাহার পুনরাবির্ভাব হইতেছে।

সকলেই নীরব, নির্জনতা যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ সেই নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া শ্রদ্ধানন্দকে বলিতেছেন, তুমি অমরনাথ গিয়েছ? তিনি উত্তর করিলেন, আজ্ঞে না। আমার ঘুরতে ইচ্ছা হয় না। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, বেশ বেশ, খুব ভাল। ঘুরলে ঘুর-বাই হয়ে যায়। যারা আধ্যাত্মিক উন্নতি চায়, যারা যথার্থ জ্ঞান চায়, তারা ঘুরবে না।

(দক্ষিণেশ্বর দেখাইয়া) ঐ দেখ, আমাদের অমরনাথ। ভগবান মানুষশরীর নিয়ে ঐ স্থানে প্রায় ত্রিশ বৎসর লীলা প্রকাশ করেন। কত সমাধি, কত দর্শন, কত আলাপন মায়ের সঙ্গে হয়েছে। মা-ই পরব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। দক্ষিণেশ্বর আমাদের জীবন্ত অমরনাথ!

আবার কিছুকাল নীরব। কতক্ষণ পর ভক্ত নৃপেন সাহা আসিলেন। হাতে একটা বড় পাত্র। শ্রীমহাপুরুষকে বলিলেন, এতে ছানাবড়া আছে। মহাপুরুষ বালকের ন্যায় আনন্দে উত্তর করিলেন, বা, বা। সব ঠাকুরকে দেওয়া হোক। কাল সকালে এই পাত্র করে প্রসাদ নিয়ে যাবে। নৃপেন প্রায় রোজ সকালে মঠ দর্শন করিতে আসেন কলিকাতা হইতে।

পাত্রের মুখ খুলিয়া ছানাবড়া শ্রীমহাপুরুষকে দেখাইলেন। অনেক ও অতি উত্তম জিনিস। মহাপুরুষের আনন্দ ধরে না। 'অতি সুন্দর মিষ্টি!

ঠাকুরকে খাওয়াতে বল আজই।' — এমন স্বাভাবিক ভক্তিভরে বলিলেন এই কথাটি, ঠাকুর যেন তাঁহার কাছে জীবন্ত।

৩

শ্রীম — তা বই কি! ঠাকুর অন্তরঙ্গদের কাছে জীবন্ত, সত্যই জীবন্ত! শশীমহারাজ এক একখানা লুচি ভাজিয়ে ঠাকুরকে দিতেন — দেখতেন, সামনে বসে খেতেন। তখন ঠাকুরের স্থূল শরীর চলে গেছে! শুনেছি, ঘরে কিছুই নাই। কি ভোগ দেবেন। অভিমানে সমুদ্রের বালি আনতে যাবেন। ফটকের সামনে এক ভক্ত দশ টাকা দেন। সমুদ্রে না গিয়ে বাজারে গেলেন। সব কিনে রেঁধে ভোগ দেন।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৩শে নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সাতটা, একটি সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ খাটের উত্তর প্রান্তে উপবিষ্ট। সাধুটি উঠিতেই মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন, সচ্চিদানন্দ শিব, সচ্চিদানন্দ শিব। প্রণাম করার পর কাহাকেও কাহাকেও কখন এইরূপ মহামন্ত্র শ্রবণ করান তিনি।

বেলা সাড়ে দশটা। শ্রীমহাপুরুষ দোতলার দক্ষিণের ঘরে গিয়া বসিলেন খাটে, দক্ষিণপূর্ব কোণে। একজন গাইয়ে ভক্ত যুক্তকরে বলিতেছেন, মহারাজ আমার কিছু হ'ল না। ভজন সাধন করতে পারি না। কাঁদি কেবল তাঁর কাছে এই বলে। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন অতি স্নেহভরে ভরসা দিয়া — যদি 'মা মা' বলে কাঁদতে পার, তা হলে তো সব হয়ে গেল। তোমার আর কিছু দরকার হবে না। একটি সাধু পুষ্পপাত্র লইয়া স্বামীজীর ঘরে যাইতে যাইতে এই মহাবাণী শুনিলেন। তিনি মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া ভাবিলেন, কি সহজ পথ বলে দিলেন — কাঁদ মার কাছে। ঠাকুরও এই সহজ ও নূতন পথ দেখাইয়া বলিয়াছেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। তিনি অবশ্যই শুনবেনই শুনবেন — দেখা দেবেন।

খানিকবাদে মহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় একা একা বেড়াইতেছেন। মাঝে মাঝে উচ্চারণ করিতেছেন, "শম্ভু শিব শম্ভু শিব।" একটি সাধু স্বামীজীর ঘরে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। তিনি উহা বন্ধ করিয়া

শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন — যেন একাকী সিংহ বেড়াইতেছেন।

সন্ধ্যার একটু বাকী আছে। গঙ্গার ধারের বারান্দায় দোতলায় শ্রীমহাপুরুষ প্যাসেজের পাশে চেয়ারে বসা। রাজপুরের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পাদমূলে বসিয়া আছেন। আর কেহ কেহ এদিকে ওদিকে দাঁড়াইয়া আছেন।

নারায়ণবাবু আসিয়াছেন। বরানগরের মঠে ইনি খুব যাতায়াত করিতেন। ইনি ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য। নারায়ণবাবু প্রণাম করিয়া বসিয়াছেন। তিনি আনন্দের সহিত শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে বলিতেছেন, আপনার মুখে বরাহনগর মঠে ঐ গানটি শুনে আমার বড় আনন্দ হয়েছিল। মনে হচ্ছে আজও সেই স্বর শুনছি। কোনটা? — মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন। ‘হরিষে লাগি রহ রে মন, তেরা বনৎ বনৎ বনি যাই’ — নারায়ণবাবু উত্তর করিলেন আনন্দে। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকুর ওটা ভালবাসতেন না। তিনি বলতেন, সে কি, একবার মায়ের নাম করেছি এক্ষুনি হবে। ‘বনৎ বনৎ’ কি? এক্ষুনি চাই। ডাকাত পড়া ভাব। এমনি বিশ্বাস ভক্তি!

শ্রীম — আহা কি কথা — ‘যদি মা মা বলে কাঁদতে পার তা হলে তো সব হয়ে গেল।’ ঠাকুর না এলে, তার সাধুদের মুখে এ সহজ পথ কে বের করতেন? তিনিই এঁদের ভিতর বসে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ লোকদের এই অমৃত বাণী শোনাচ্ছেন।

আবার ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৪শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের বিছানার উত্তরাংশে বসিয়া আছেন। একে একে সাধুরা সকলে প্রণাম করিতে আসিতেছেন। স্বামী শর্বানন্দ প্রণাম করিয়া পশ্চিমের জানালার সামনে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, আজ কলকাতা যাব একজনকে (হোমিওপ্যাথিক) ঔষধ দিতে হবে। মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন — বাবা, ওষুধ-দেওয়া সাধু হয়ো না।

স্বামী প্রণবানন্দ বলিলেন, আমাদের বেলুড়ের গ্রামে অনেকের অসুখ বিসুখ হচ্ছে। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, পাড়ার লোকদের খবর নেওয়া

সে খুব ভাল কাজ। নেওয়া উচিত।

রাত্রি প্রায় নয়টা। মহাপুরুষের ডান হাঁটুতে ব্যথা। সেবক শঙ্করমহারাজ নুনের পুঁটলি গরম করিয়া দিতেছেন, আর মতি মহারাজ সেঁক দিতেছেন। উমেশ মহারাজ রাত্রিতে পাখা দিয়া মশা তাড়াইতেন। আজ তাঁহার অসুখ। একজন সাধু আগুনের মালসায় পাখা করিতেছেন খাটের উত্তর পাশে দাঁড়াইয়া। এই সাধুটি উঁচু হইয়া মহাপুরুষের পায়ের একজিমা দেখিতেছেন। পা-খানি একটি ছোট স্টুলের উপর রাখা। মহাপুরুষ হাসিয়া সাধুকে বলিলেন, ও তোমায় দেখতে হবে না। শৈলেশ মহারাজও পাশেই বসিয়া আছেন।

এই সাধুটি আর একদিন সকালে প্রণাম করার সময় জিজ্ঞাসা করেন, রাত্রে আপনার ঘুম হয়েছিল কি? শ্রীমহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, কেন বল দেখি? সাধু বলিলেন, প্রায়ই ঘুম হয় না শুনতে পাই, তাই। সাধুটি রোগা। তিনি বুঝিলেন, ওঁর শরীরের খবর নেওয়ার আমার অধিকার নাই। আমার নিজের ভাবনা করাই উচিত!

শ্রীম — রোগা হলোই বা। কাছে থাকা, সব দেখা ও শোনা, সাধ্যমত সেবা করা — এই-ই তো তপস্যা! এঁদের কাছে থাকলে হাজার বছরের তপস্যা হয়ে যায়। কোথায় পাবে এ তাজা মাল? জীবন্ত ধর্ম এঁদের জীবন। অবতার এলেই এই জীবন্ত ধর্ম দেখা যায়। ধর্মের ছড়াছড়ি এখন। এখন ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৭শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। সন্ধ্যা। আরতি শেষ হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ দক্ষিণের অফিস ঘরে বসিয়া আছেন খাটের উপর। এই ঘরের পূর্ব গায়ে শ্রীস্বামীজীর ঘর। সেবক মতিমহারাজ পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, আর স্বামী বিজয়ানন্দ মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঘরে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে। একটু পর উহা নিভাইয়া দিয়া একটি নীল বাল্ব জ্বালা হইল। অতি ক্ষীণ আলো। একথা সেকথা হইতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ — খোকা (সতীশ মুখার্জি) আসে না বসুমতীর?

স্বামী বিজয়ানন্দ — না। সকলে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জ্জুনস্তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্

সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ কি করবে মানুষ! তিনিই মহামায়াতে এরূপ করাচ্ছেন। (গীতা ১৮-৬১)।

স্বামী বিজয়ানন্দ — ‘বলাদাকৃষ্য’, চণ্ডীতে আছে।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ (চণ্ডী)

জ্ঞানীদেরও এই অবস্থা।

রাত্রি ৭।১৫ মিনিট। হিমাংশুর প্রবেশ। যুবক, ২২।২৩ বছর বয়স। স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রাতা তুলসীরামবাবুর দৌহিত্র। কলিকাতায় বাড়ি। মাস্টারমহাশয়ের ওখানে যাতায়াত করেন। হিমাংশু প্রণাম করিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — কি রে কেমন আছিস্, ভাল তো?

হিমাংশু — আজ্ঞে না। মন খারাপ।

শ্রীমহাপুরুষ — কেন মন খারাপ? তোর বাপ মা সকলেই ঠাকুরের আশ্রিত। তুই আমাদের আশ্রিত। মন খারাপ কেন হবে? মঠে আসবি, আর মাস্টারমশায়ের ওখানে যাস্। আর কোথাও যাস্ না। এমনি করবি। কোথায় বসিস্ জপ ধ্যান করতে? জানিস্ তো ঠাকুরের গান — ‘আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো না কারো ঘরে। যা চাইবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥’ ভিতরেই সব।

শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া নিজের ঘরে যাইতেছেন নিজের মনে গাহিতে গাহিতে — ‘যা চা’বি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।’

শ্রীম — বেশ কথা। ‘যা চা’বি তা বসে পাবি — খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।’ ঠাকুর যখন গাইতেন, তখন মনে হতো যেন সব পাওয়া হয়ে গেছে। তিনি ঈশ্বর নরকলেবরে — সামনে দেখছে ভক্তরা। তাই মনপ্রাণ সব পূর্ণ আনন্দে, অজ্ঞাত আনন্দে। কে চায় তখন অন্য জিনিস? অন্য নাই তখন। তখন সব এক।

পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৮শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। মঠের দোতলার দক্ষিণের ঘর। এখানে ওয়ার্কিং কমিটি বসে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। পূর্ব-

দক্ষিণ কোণে একখানা খাট পাতা। তাহার উপর বিছানা। ইহাতে আজকাল স্বামী নিখিলানন্দ শো'ন। শ্রীমহাপুরুষ ঐ বিছানায় বসিলেন লেপের উপর, পূর্বাস্য। নীল বাল্‌ব জ্বলিতেছে।

নিচে মেঝেতে বসিয়া আছেন ইটালীর (ইন্টালী) দুইজন ভক্ত। একজনের নাম সুন্দর, তিনি যুবক। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে। স্বামী রাঘবানন্দ আজকাল ইটালীতে রহিয়াছেন। 'কেনোপনিষদ্'-এর প্রবচন করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, ওতে দেবীর আবির্ভাবের কথা আছে। দেবাসুর যুদ্ধের পর দেবতাদের অহংকার হয়েছিল। তা ভাঙবার জন্য দেবী এলেন। ওঁরা চিনতে পারলেন না।

যক্ষরূপ ধারণ করে এসেছিলেন। ইন্দ্র অগ্নিকে পাঠিয়ে দিলেন খবর করতে, কে এসেছেন। অগ্নি গেলে যক্ষরূপী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? উনি উত্তর করলেন, আমি অগ্নিদেব। তোমার শক্তি সামর্থ কতদূর? — দেবী জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সকল পৃথিবী দগ্ধ করে ফেলতে পারি — অগ্নি উত্তর করলেন। বেশ, এই তৃণটি দগ্ধ কর দিকিন, দেবী বললেন। অগ্নি পোড়াতে পারলেন না যথাসাধ্য চেষ্টা করেও। ইনি ফিরে গেলেন। তারপর এলেন পবনদেব। তিনিও ঐ তৃণটিকে নড়াতে পারলেন না। এই কথা শুনে ইন্দ্রের মনে সন্দেহ হয়েছে, দেবী ব্রহ্মশক্তি নিশ্চয় এসেছেন। ইন্দ্র তাই নিজে এসেছেন। দেবী তখন আকাশে উমা হৈমবতীরূপে বিরাজমানা। ইন্দ্র তাঁকে সর্বাগ্রে চিনেছিলেন বলেই তিনি দেবরাজ।

মা না চেনালে কেউ চেনাতে পারে না তাঁকে। ঠাকুর তাই সর্বদা প্রার্থনা করতেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না, মা।' দেখছেন কিনা, সর্বদা ভুলিয়ে দিচ্ছেন। গীতাতেও আছে —

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জ্জুনস্তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়াণি মায়য়া॥ (গীতা ১৮-৬১)

তাঁর মহামায়াতে সবাইকে চালাচ্ছেন। শোন নি ঠাকুরের গল্পটি? পুতুল নাচছে (হাতে দেখিয়ে), এদিকে হেলছে ওদিকে হেলছে। বালকগণ মনে করে পুতুল আপনিই নাচছে। কিন্তু নাচাচ্ছে আর একজন ধরে। তেমনি মানুষ মনে করে, আমরা সব করছি। অজ্ঞানে দেখতে পায় না

তাঁর হাত।

একজন ভক্ত — অহংকার থেকে হয় এটা?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ। অহংকার না থাকলে আবার কাজও হয় না, ছোট বড় যত। তবে ‘আমি তাঁর ভক্ত, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর দাস’ — এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হয়। তা হলে মা বাঁধেন না, ছেড়ে দেন। শরণাগত হয়ে থাকা আর কি। মা শরণাগত, মা শরণাগত — সদা এই প্রার্থনা করতে হয়।

শ্রীম এতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া ডায়েরীপাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন। এবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — হাঁ, তাঁর মহামায়াতে সবাইকে চালাচ্ছেন। আলুপটল নাচছে। আগুন সরিয়ে নিলে, তক্ষুনি নাচ বন্ধ। মানুষ অজ্ঞানেতে দেখতে পায় না তাঁর হাত।

সাধু মিষ্টিমুখ করিয়া প্রণামান্তে বিদায় লইলেন।

বেলুড় মঠ।
২৯শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্রপুঞ্জ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শ্রীম চেয়ারে দোরগোড়ায় একাকী, দক্ষিণাস্য। এখন অপরাহ্ন চারিটা।

আজ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

বেলুড় মঠ হইতে একটি সাধু আসিয়াছেন। সাধুকে সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়াই আনন্দে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, এই যে জগবন্ধু, আসুন আসুন। বসতে আজ্ঞা হোক।

সাধু প্রণাম করিয়া শতরঞ্জিপাতা জোড়া বেঞ্চিতে বসিলেন। কুশল প্রশ্নাদি হইতেছে।

শ্রীম (সস্নেহে) — কেমন করে এলেন? সংবাদ পেয়েছিলাম, আপনার শরীরটা ভাল ছিল না।

সাধু — এখন একটু ভাল বোধ করছিলাম। তাই ভাবলাম আপনার কাছে একবার হয়ে আসি। ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল।

শ্রীম — তুমি তো দেখছি ডায়েরী এনেছ। শোনাতে পারবে? কষ্ট হবে না তো?

সাধু — আজ্ঞে না, কোনই কষ্ট হবে না। বরং আনন্দ হবে। এই ভেবেই তো সঙ্গে ডায়েরী এনেছি।

শ্রীম — আচ্ছা, পড়ে শোনাও।

সাধু ডায়েরী পাঠ করিতেছেন।

বেলুড় মঠ। ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

শ্রীমহাপুরুষ অসুস্থ। ডক্টর অমর মুখার্জির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে। এখন অপরাহ্ন চারটা। অমরবাবু দেখিতে আসিয়াছেন। মহাপুরুষ নিজের ঘরে চেয়ারে বসা, দক্ষিণাস্য। ডাক্তার উত্তরাস্য একটা বেতের

মোড়াতে বসিয়াছেন।

একটি সাধু আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়াছেন। মহাপুরুষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি কেন? দেখাবে না কি ডাক্তারকে? সাধু লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

পাঠ চলিতেছে।

আজ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। সকালে আটটার সময় মহাপুরুষ গঙ্গার ধারের বারান্দায় খোকা মহারাজের ঘরের উত্তর পাশে চেয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া জামা পরিতেছিলেন। পাশে সেবক উমেশ মহারাজ। অন্তেবাসী স্বামীজীর ঘরের সেবক। তিনি সিঁড়ি ঝাঁট দিয়া ঝাঁটা রাখিতে ছাদে যাইতেছেন। মহাপুরুষ মৃদুভাবে বলিলেন, তুমি এটা (গঙ্গার দিকে বারান্দা) ঝাঁট দেও না? অন্তেবাসী প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। ছাদ হইতে ফিরিবার সময় আবার বলিলেন, তুমি এটা ঝাঁট দাও না? উনি উত্তর করিলেন, আজ্ঞে দিই। কাল দিয়েছি। মহাপুরুষ প্রসন্নভাবে বলিলেন, হাঁ বাবা দিও, স্বামীজীর ঘরের সামনেটা ঝাঁট দিও।

অপরাহ্ন সাড়ে চারিটা। বেলুড় মঠ। খোকা মহারাজের ঘরে শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। ঢাকার একটি ভক্ত মহিলা আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া জোড়হাতে পায়ের নিচে মেঝেতে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আমার মন যেন স্থির হয় ঠাকুরের পায়ে, আশীর্বাদ করুন। মেয়েটি যুবতী স্ত্রী, মহাপুরুষের কৃপাপ্রাপ্ত। খুব ভক্তিমতী আর তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্রী।

শ্রীমহাপুরুষ সস্নেহে উত্তর করিলেন, জপ করিস্ তো রোজ? আর প্রার্থনা করবি ঠাকুরের কাছে সর্বদা — যাতে সৎসঙ্গে রাখেন। আর তাঁকে না ভুলি।

সেবক শঙ্কর মহারাজ মহাপুরুষের জলখাবার নিয়া আসিলেন, ফল ও সন্দেশ। কাশি বলিয়া ফল খাইলেন না। কেবল একটি সন্দেশ খাইলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা। শীত পড়িয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজ নিত্যকার স্থানে বারান্দায় বসিয়া আছেন চেয়ারে, খোকা মহারাজের ঘরের পাশে। সম্মুখে গঙ্গা। গরম গেঞ্জি গায়ে, তাহার উপর একটি কোট। গরম র‍্যাপারে শরীর ঢাকা। মাথায় কানঢাকা টুপি। একমনে কি ভাবিতেছেন। বাহ্যদৃষ্টি গঙ্গার দিকে।

শৈলেশ মহারাজ উত্তর পাশে দাঁড়ান। দক্ষিণ দিকে স্বামীজীর ঘরের সামনে দুইটি ভক্ত যুবক। প্যাসেজে দাঁড়ান অন্তেবাসী। সেবক শঙ্কর ও মতি মহারাজ যাওয়া আসা করিতেছেন।

খানিক পর শ্রীমহাপুরুষ শৈলেশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রী মহাপুরুষ (শৈলেশের প্রতি) — বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কৃত) দেখলাম। তোমার পড়া হয়েছে?

শৈলেশ — আজ্ঞে, ঢাকায় একবার দেখেছিলাম। আপনি পড়বেন না?

মহাপুরুষ (বালকের ন্যায় সহাস্যে) — হাঁ। আর কি হবে ঐসব পড়ে? এখন সব চাই realisation (অনুভূতি)। ইতিহাস পড়ে কি হবে?

ঠাকুর যা বলে গেছেন সেই ঠিক — 'তিনিই তাঁর। তিনিই তাঁর, তিনিই তাঁর।' কতবার শুনেছি। তিনি 'আমি' 'আমার' বলতে পারতেন না। তিনি বলতেন, এই জগৎও তিনি। আর বলতেন, 'তিনিই তাঁর, তিনিই তাঁর, তিনিই তাঁর।'

মন অন্তর্মুখীন, কি স্মরণ করিতেছেন। এবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, 'ঈশ্বর মায়া জীবজগৎ', 'ঈশ্বর মায়া জীবজগৎ' — কতবার শুনেছি একথা তাঁকে বলতে। এ সবই তিনি।

এখন আবার কবে চলে যেতে হবে তার ঠিক নাই। এখন আর এসব কেন? এখন কেবল realisation (উপলব্ধি)।

দশজনের উপকার হবে — তা আমার কি হলো তাতে!

শৈলেশ — আপনার তো সব হয়েই রয়েছে।

মহাপুরুষ — হাঁ, তিনি সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

গঙ্গার অপর পারে 'কুঠিঘাট' স্টীমার-ঘাট। হঠাৎ ঘাটের বৈদ্যুতিক আলোগুলি মালার আকারে জ্বলিয়া উঠিল। উহা দেখিয়া মহাপুরুষ বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। বলিলেন বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। তবে এরা খামখেয়ালী লোক। আজ এত আগেই আলো জ্বেলে দিয়েছে। সন্ধ্যা এখনও হয় নাই। কাল অনেক পরে জ্বালিয়েছিল। (একটু হেসে) তা দিলেই বা। আলো দেওয়ার তো কথা — তা একটু আগেই দিল বা।

নিচে লনে স্বামী নিখিলানন্দ পায়চারি করিতেছেন। ঠাকুরঘরে আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। সাধুরা সকলে সেখানে গিয়াছেন। আরতি শেষ হইল সাড়ে ছয়টায়। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছেন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে।

অন্তেবাসী স্বামীজীর ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন, ঘর খুলিবেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, আরতি হয়ে গেছে? মতি মহারাজ মশা তাড়াইতেছিলেন, উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। অন্তেবাসীও প্যাসেজ হইতে বলিলেন একসঙ্গে — আজ্ঞে হাঁ, এইমাত্র হল। আমরা এই এলাম। 'এইমাত্র হলো' — বলিতে বলিতে মহাপুরুষ মহারাজ উঠিয়া প্যাসেজ দিয়া স্বামীজীর ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্তেবাসী আবার বলিলেন, আজ্ঞে, এই ফিরে এসে দরজা খুলছি। মহাপুরুষ বলিলেন, আমি ভাবছি এখনও চলছে — 'তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো'। এখনও কানে এই কথা বাজছে (বালকের ন্যায় হাস্য)।

প্যাসেজ দিয়া আবার নিজের ঘরে ঢুকিলেন। অন্তেবাসী খোকা মহারাজের ঘরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন মহাপুরুষ বলিতেছেন, 'কৃপা হি কেবলম্, কৃপা হি কেবলম্'।

এবার আসিয়া আফিস ঘরে বসিলেন খাটের উপর। ঘরে নীল রঙের আলো জ্বলিতেছে। সামনেটা একটা নীল কাগজে ঢাকা। মতি পায়ের নিচে বসিয়া মশা তাড়াইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ধ্যানস্থ।

শ্রীম — দেখ, বললেন সাধুসঙ্গ নিত্য করবে। সব ভুলিয়ে দেন কিনা তাঁর মায়া। সাধুসঙ্গে থাকলে ভুলটা সংশোধন হয়। সাধুকেও ভুলিয়ে দেন। কিন্তু সাধু শীঘ্র নিজের ভুল ভাঙ্গতে পারে। সংসারের লোকের পক্ষে বড় কঠিন। তাই সদা সাধুসঙ্গ চাই। দেখ না মহাপুরুষকে — সর্বদা কাঁটা উত্তর দিকে, অত অসুখ বিসুখেও।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। আজ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, ২০শে অগ্রহায়ণ, শনিবার। এখন সকাল সাতটা। মহাপুরুষ নিজের খাটে বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিতে আসিতেছেন। মহাপুরুষের গায়ে গরম জামা — বৃন্দাবনী তুলার জামা, খয়েরী রং এর।

একটি সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মহাপুরুষ গম্ভীর আনন্দময় ভাবে উচ্চারণ করিতেছেন, ‘জগবন্ধু, জগবন্ধু, জগবন্ধু’। (প্রণত সাধুকে দেখিয়া) ‘সেই আসল জগবন্ধুর কথা মনে হল। জয় জগবন্ধু, জয় জগবন্ধু।’

ঘরে কয়েকজন সাধু আছেন দাঁড়াইয়া। স্বামী বিজয়ানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘মুখে বলে লোকে। কিন্তু, যদি তাঁর কৃপায় ভিতরে একটু feel (অনুভব) ক’রে বলে তবে বড়ই আনন্দ হয়।’

কিয়ৎকাল অন্তর্মুখীন ভাবে নীরব। আবার মৃদু হাস্যে বলিলেন, ‘তবে ভাল কথার খারাপও ভাল’, লোকে বলে।

চিরঞ্জীব শর্মা ছিলেন কেশববাবুর দলে। উনি ন’দের দিকে tour (ভ্রমণ) করতে গিছিলেন, তখন তাঁকে নিয়ে আসেন। চিরঞ্জীববাবু খুব সুন্দর গান বাঁধতে পারতেন। ঠাকুর....। কেশববাবু সারমন দিতেন। তাঁর উপর গান বাঁধতেন।

স্বামী বিজয়ানন্দ — ‘ঠাকুর’-এর কি কথা বলতে যাচ্ছিলেন?

মহাপুরুষ — হাঁ। এমন সুন্দর ভাব গানের, দেখে ঠাকুর কখনও বুঝতে পেরে উঠতেন না — ঠিক ঠিক ভাব থেকে বেঁধেছেন গান, না শুধু কবিত্ব? উনি বলতেন, একেবারে কিছু না বুঝলে কি আর বাঁধতে পারি? কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে।

ঠাকুরের ভাব — শুধু কবিত্ব ভাল নয়। একটু ভাব ভক্তি থাকে তো বেশ।

আজ বেলা আটটার সময় মিসেস ভন কেলার (Von Keller) শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া রহিয়াছেন। মহাপুরুষ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ধীরভাবে মিসেস ভন কেলার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'the same soul has form and is formless — is it so?' (একই অন্তরাত্মা সাকার আবার নিরাকার — এই কি?)

মহাপুরুষ খাটে বসা নিজের ঘরে — মাথা নিচু করিয়া মিসেস ভন কেলারের কানের কাছে মুখ করিয়া প্রশান্তভাবে বলিতেছেন, yes (হাঁ)। জোরে না বলিলে ভক্তটি শুনিতে পান না। তারপর অতি আর্তির সহিত ভক্ত মহিলাটি বলিতেছেন, I wish to come to you often. I can not come here so often. People come here always. It is crowded. (আমি প্রায়ই আসতে চাই আপনার কাছে। কিন্তু কৃতকার্য হই না। লোক সর্বদা আপনার কাছে আসে। তাতেই ভীড় হয়ে যায়)।

২

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ প্রতিদিনের মত গঙ্গার দিকের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন। পাশে কেহ কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী নিখিলানন্দ খ্রীস্টান মিশনারিদের কথা বলিতেছেন। তাহারা সেবার কাজ করে বটে, কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য এদেশের লোককে খ্রীস্টান করা।

শ্রীমহাপুরুষ — এদেশের ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক — এরা সব তো ক্রাইস্টকে নিয়েছে। মিশনারিদের করা উচিত — তোমাদের যা আছে দাও, আমাদের যা আছে নাও। মিশনারিরা খালি দেয়, নেয় না। তাই তারা বিশেষ কিছু লাভবান হতে পারে না। এদেশ থেকে তারা ধর্মতত্ত্ব নিতে নারাজ। গোঁড়ামি। কিন্তু এতে ঠকে যাচ্ছে। স্কুল কলেজ হাসপাতাল — এসব কাজ বেশ করছে।

নিখিলানন্দ — মুসলমানরা ওদের মতই গোঁড়া। নিতে নারাজ।

মহাপুরুষ — ওদের কি ধর্ম — খালি সামাজিক ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে। কে কোথায় কি করলো, মসজিদের সামনে কে বাজনা বাজালো — এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেবল কলহ করে। মহম্মদের প্রেম ভক্তির উপর নজর নাই! তবে ভাল লোক সকলের মধ্যেই আছে।

মিসেস ক্লার্ক (Clarke) খুব ভাল লোক, খুব বিদুষী। অমনি দেখে বোঝা যায় না — চুপচাপ থাকেন। লেখা দেখে মনে হল, মহৎ লোক। কলকাতায় একটানা আট মাস ছিলেন। এখানে আসতেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যানজপ করতেন। আর আমার সঙ্গে দু’পাঁচ মিনিট কথা। ব্যস, আর কিছুতেই নাই।

যারা উদারতা চায় তাদের এখানে আসতেই হবে। আর যারা এসেছে, বুঝতে হবে ঠাকুরের উদার ধর্ম তারা নিতে এসেছে।

স্বামী নিখিলানন্দ — রবিবাবুর অস্ট্রেলিয়ার ট্যুরে একটা সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল। সন্ধ্যার সময় জাহাজে ধূপের গন্ধ এলো। রবিবাবুর সঙ্গীরা মনে

করলেন, নিশ্চয়ই এখানে অন্য ভারতবাসী রয়েছে। নইলে ধূপের গন্ধ এলো কি করে। একজন গন্ধ ধরে একটা কেবিনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে একজন সাহেব। উনি বললেন, আসুন ভিতরে আসুন। রবিবাবুর সঙ্গী ভিতরে গিয়ে দেখলেন, ঠাকুর ও স্বামীজীর বড় বড় ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে। সাহেব বললেন, আমি এঁদের কথা শুনে অবধি এঁদেরই ধর্মজীবনে গুরু ও ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি। সাহেবের বাড়ি ইংলণ্ডে। তাঁর কাছে কেউ প্রচার করে নাই এঁদের, তবুও নিয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ (অন্তর্দৃষ্টির সহিত) — বাঃ, দেখ ঠাকুরের নাম কি ভাবে তিনি নিজেই প্রচার করছেন! এতে রবিবাবুরও আক্কেল হবে।

স্বামী নিখিলানন্দ — মিসেস ভন কেলার (Von Keller) বলেছেন, এ-ও বাহাদুরী রবিবাবুর।

শ্রীম — ঠাকুরের মহাবাণী রয়েছে — আন্তরিক যে ভগবানকে ডাকবে তাঁকে এখানে আসতে হবে। এই দেখ না, কেমন আসছে। মানে হল এই, তিনি তো অন্তরাত্মা সকলের। সেখান থেকে সব দেখেন। যে সরল, তাকে পাঠিয়ে দেন তাঁর ভাবের কাছে। এই যেমন, মঠে বা কোনও ভক্তের কাছে — যারা ঠাকুরকে ধরে রয়েছে।

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। শীতকাল। সকাল সাতটা। সাধুরা দলে দলে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এইবার একটি সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ সকরুণভাবে উচ্চারণ করিতেছেন, 'জগবন্ধু, জগবন্ধু, জগবন্ধু'। আর একটি ব্রহ্মচারী প্রণাম করিতেছেন — নাম নাঞ্জাপ্পা (নারায়ণ চৈতন্য)। ঐ করুণামাখা স্বরে পুনরায় উচ্চারণ করিলেন — মা মা, শিব শিব।

মঠে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন রাত্রি সাড়ে ছয়টা। আজ রবিবার বলিয়া অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। আরতির পর অনেকে আসিয়া বসিয়াছেন দোতলার দক্ষিণের ঘরে। শ্রীমহাপুরুষ বারান্দা হইতে আসিয়া এই ঘরেই বসিয়াছেন, খাটের উপর, পূর্বাস্য। ভক্তরা সব মেঝেতে, পশ্চিমাস্য। কেহ কেহ এদিক ওদিক দাঁড়াইয়া আছেন। একটি

সাধু দরজায় বসা।

আজ অপরাহ্নে মঠের লনে ভক্তদের মধ্যে বিচার হইয়াছিল — প্রারব্ধ ও ঈশ্বরেচ্ছা — কোন্‌টা বড়। সেই সব কথা তুলিয়াছেন মণিবাবু, স্বামী বাসুদেবানন্দের ভাই। ইনি সরকারী কর্মচারী।

মণি — মহারাজ, আজ আমাদের বিচার হচ্ছিল, প্রারব্ধ বড় কি ঈশ্বরেচ্ছা বড়। মানুষ চালিত হয় কোনটায়?

শ্রীমহাপুরুষ — আমায় যদি জিজ্ঞাসা কর বাবা, আমি এই বুঝেছি বুড়ো হয়ে — সবই ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলছে। তাঁর স্বভাব ঠিক বালকের ন্যায়। ঠাকুরের কথা শুন নাই, তিনি বলতেন ঈশ্বর বালকস্বভাব? একটি বালক অনেক টাকাকড়ি পাশে নিয়ে বসেছে। লোকেরা চাইছে, দাও। সে কাউকেও দিচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ, চায় নাই একজন, তাকে ডেকে দিয়ে দিলে, ন্যাও। যারা চাইলো তাদের দিলে না, যে চাইলো না তাকে দিল। এইরূপ স্বভাব ঈশ্বরের।

মণি — স্বামীজীর লেক্‌চারগুলোর ভিতর কি সুন্দর সব কথা আছে। একস্থানে বলেছেন, যে মানুষের উপর নির্ভর করবে, সে ঈশ্বর থেকে তত দূর হয়ে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ — ঠিক কথা। ঠাকুর বলতেন, হাওড়া থেকে যত কাশীর দিকে যাবে, হাওড়া থেকে তত দূর হয়ে যাবে।

(সহাস্যে) আর একটি গল্প বলেছিলেন। কৈলাসে একদিন শিব ও গৌরী বসে আছেন। একটি ব্রাহ্মণের বড় দুঃখ। মা তাই শিবকে বললেন, এ তোমার ভক্ত। কেন একে এত দুঃখ দিচ্ছ, তোমার দয়া হয় না? শিব বললেন, দেখবে? আচ্ছা। এই বলে কতকগুলি টাকাকড়ি মণি-মাণিক্য রাস্তায় রাখিয়ে দিলেন। ঐ পথে ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ চলছিল। ঐ ধনের কাঁড়ির একটু দূর থেকে ব্রাহ্মণের মনে উঠলো, আচ্ছা অন্ধ কিভাবে চলে রাস্তায় দেখবো। বলেই চোখ বুজে চলতে লাগলো। ঐ ধনের স্তূপ পার হয়ে গেল ঐরূপে। তখন শিব বললেন মাকে, দেখলে! ওর কপালে দুঃখ আছে। রাখতে পারবে না দিলেও।

পণ্ডিতরা আর শাস্ত্র বলে, এটাই কর্মফল। আমরা বাবা জানি, সবই তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে।

শ্রীম — এই প্রারব্ধও বদলে যায় ঈশ্বরের কৃপা হলে — ঠাকুর বলতেন। ঐ গানটি গাইতেন,

‘কপালে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
তবে ও মা তোর দুর্গানাম কে নেবে?’

আবার আছে —

‘দুর্গা দুর্গা বলে যদি মা মরি।
আখেরে না তারো কেমনে জানা যাবে গো শংকরী॥’

ঠাকুর সব পারেন। পাঠ চলিতেছে।

আজ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। সন্ধ্যারতির পর দোতলায় আফিস ঘরে শ্রীমহাপুরুষ বসা খাটে। সাধুরা কেহ কেহ আসিয়াছেন — স্বামী ওঁকারানন্দ, গঙ্গেশানন্দ প্রভৃতি। অবতারের আসার প্রয়োজনীয়তার কথা চলিতেছে। স্বামী ওঁকারানন্দ বলিলেন, অবতার না হলে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, এটা আমার সুদৃঢ় ধারণা, অবতার না এলে ঈশ্বরকে বোঝা যায়ই না। তোমাদের সঙ্গে কথা হ’লে কতবার এই কথা বলেছি, শোন নাই? এ আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীম — ঠিক কথা। অবতার না এলে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। ঠাকুর বলেছিলেন — মাঠের মাঝে একটা দেয়াল। তাতে একটা গোল বৃহৎ ছিদ্র আছে। এ দিয়ে ওপারের জমি, বাড়ি, বাগান, সব দেখা যায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বল তো সেটা কি? আমরা উত্তর করলাম, ওটা অবতার — আপনি। খুব খুশি হলেন শুনে। অবতার আসেনই ধর্ম সজীব করতে।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। দোতলার গঙ্গার দিকের বারান্দায় ছোট ঘরের দেয়ালের গায়ে শ্রীমহাপুরুষ চেয়ারে উপবিষ্ট। শীত পড়িয়াছে, তাই গরম বস্ত্র পরিয়াছেন। মাথায় কানঢাকা টুপি। গরম র‍্যাপারে শরীর আবৃত। শীতকাল বলিয়া গঙ্গায়ও লোকচলাচল কম।

এখন পৌনে ছয়টা। ঠাকুরঘরে আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। একটি মাড়োয়ারী ভক্ত আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন, ওঁ নমো নারায়ণায়’

বলিয়া। ভক্তটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ। প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে বসিলেন। কখনও কখনও আসেন দর্শন করিতে।

ভক্ত — মহারাজ, মন্‌মে শান্তি স্থায়ী নেহি হোতি হ্যায়।

মহাপুরুষ — সুবো শাম, দোবার ভগবানকো, সত্যনারায়ণকো প্রার্থনা করনা, কি, প্রভো তুমারে পাদপদ্মে ভক্তি দো। ম্যায় মূর্খ হুঁ, মূঢ় হুঁ। ম্যায় সংসার-সাগরমে গির গয়া। মুঝকো তুমারা চরণকমলমে ভক্তি দো।

ওহি ভক্তিই সার। আউর সব দো দিনকা বাস্তে হ্যায়। দো দিন বাদ সব চলা জায়েগা। ভগবানকা পাদপদ্মে ভক্তি নেহি জায়েগী। বালবাচ্চা, ঘরবাড়ি, স্ত্রী, সংসারকা দৌলত — এসব চীজ চলী জায়েগী। সুবো শ্যাম দো মিনিট পাঁচ মিনিট এহি প্রার্থনা করনা।

ভক্ত — আপকো কষ্ট হোতা হ্যায়, ইস্‌লিয়ে পুছতাছ করনে কী ইচ্ছা নেহি হোতী।

মহাপুরুষ — নেহি। থোড়ী বাত অচ্ছি হ্যায়। যাস্তি নেহি বোল সকতা। সারা দিন চুপচাপ বৈঠা রহতা হুঁ। আওর কভি কভি এ্যাইসি সার বাত বোলতা হুঁ। গুরু মহারাজ, সত্যনারায়ণ সব মঙ্গল কর দেংগে।

ভক্ত — মহারাজ, বড়ি শান্তি হোতি হ্যায় য়হাঁ আনেসে।

মহাপুরুষ — উধর উপর দো মঞ্জিলমে ঠাকুরঘরমে যানা চাহিয়ে। যাও, একদফে যানা জরুর চাহিয়ে। ও আচ্ছা হ্যায়। দর্শন প্রণাম করনা চাহিয়ে — অওর প্রসাদ লেনা।

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দের প্রবেশ। ইনি মঠের ম্যানেজার।

মহাপুরুষ — ইনি ও বাড়িটা কিনবেন (মঠের দক্ষিণ দিকের)। কে একজন মুসলমান খরিদ্দারও রয়েছে। এঁকে নিয়ে যাও ঠাকুর ঘরে, দর্শন করে আসুন। আর প্রসাদ দিও। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

মাড়োয়ারী ভক্তটি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। যাইবার পূর্বে পকেট হইতে কয়েকটা এলাচদানা বাহির করিলেন। মহাপুরুষ হাত পাতিয়া লইলেন। আর সবগুলিই একসঙ্গে মুখে ফেলিয়া দিলেন — শ্রদ্ধার দান, তাই সময় ও স্বাস্থ্যের বাধা না মানিয়া।

শ্রীম — ভক্তিতে সব শুদ্ধ হয়। এই একটি থাকলে সব আছে। এটার অভাবে সব নষ্ট। ভক্তের কাছে ভগবান বাঁধা পড়েন।

পাঠ চলিতেছে।

৩

বেলুড় মঠ। খোকা মহারাজের ঘর। আজ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৩৫ সাল। শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। এখন এগারটা। একটি ভক্ত স্ত্রীলোক আসিয়া প্রণাম করিলেন। ইনি মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্যা। কুশল প্রশ্নাদির পর ভক্তটি অতিশয় ভক্তিভরে নিজের আর্তি নিবেদন করিতেছেন।

ভক্তমহিলা — গুরুদেব, আমার কি হবে? অনেক খুঁজে আপনাকে পেয়েছি। আমার কি ভগবানদর্শন হবে?

মহাপুরুষ — হাঁ মা, হবে। বলছি, হবে হবে হবে।

ভক্ত মহিলা (অধিকতর আর্তির সহিত) — বলুন, গুরুদেব হবে কি না? তাঁকে পাব, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবে?

মহাপুরুষ — হবে মা হবে। বলছি তো হবে। একশ’ বার কি বলতে হয় মা? হবে। তোমার কিছু ভাবনা নাই।

ভক্ত মহিলা (কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) — আমরা গেরস্থ লোক, সর্বদা ঘরে কোলাহল। জপধ্যান যেরূপ করা উচিত সেরূপ হয়ে ওঠে না। আচ্ছা, যেখানে সুবিধা সেখান জপ করতে পারি কি? (ঠাকুরের ছবির সামনে জপ না করিলে কি কোনও দোষ হইবে — এই অভিপ্রায় ভক্তটির)।

মহাপুরুষ — হাঁ। সকাল সন্ধ্যায় একটু দেখে প্রণাম করবে।

ভক্ত মহিলা — ছাদের উপর, কি কোনও নির্জন স্থানে বসতে পারি কি? সংসারীদের শত অসুবিধা।

মহাপুরুষ — তারই মধ্যে একটু —। হাঁ, ছাদে বসবে।

স্বামীজীর ঘরের কোণে একটি সাধু বসিয়া এই কথোপকথন শুনিতেছেন। ভক্তিমতীর সরল ও অকপট প্রার্থনা শুনিয়া সাধুটি ক্রন্দন করিতেছেন। এই ভক্ত মহিলার সকরুণ আর্তি দেখিয়া তিনি বাইবেলোক্ত মার্থার ভগিনী মেরীর কথা হৃদয়ে স্মরণ করিতেছেন। ভাবিতেছেন — এঁর ঈশ্বরে ভালবাসা হয়েছে মেরীর মত। 'Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. (Luke 10/42) (মেরী যে দুর্লভ জিনিসটি বরণ করেছেন, সেটি

কখনও তাঁর নিকট থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না)।

যে 'one thing needful' (যে পদার্থটি অত্যাবশ্যক), প্রেম — এ ভক্তটির তাহা লাভ হইয়াছে। সাধুটি ক্রন্দন করিতেছেন আধ ঘন্টার উপর। আর ঠাকুরকে প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর আমায় দেখা দাও। তোমায় পেলেই দুর্বল মন সবল হয়। কুটিলতাময় এই সংসারে তোমায় ছেড়ে ক্ষণকাল থাকলেও মন কুটিলতায় বিজড়িত হয়ে পড়ে। আমি সংসারের পক্ষে নেহাৎ অনুপযুক্ত। আমায় দর্শন দিয়ে আমার মনকে শক্ত সবল করে দাও। এখন তো শক্ত নয়। কার জোরে সবল করবো? তোমার কৃপাশক্তি ছাড়া সংসারের কোনও বস্তুতেই মন সবল হয় না। বাপ, দেখা দাও তোমার অবোধ সন্তানকে।

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় শ্রীমহাপুরুষ ঐ ছোটঘরের খাটের উপর বসা। নিচে মেঝেতে কয়েকজন ভক্ত বসিয়াছেন। দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। লোকের ভীড় হওয়ায় মহাপুরুষের কষ্ট হয়। তিনি উঠিয়া বারান্দায় ধীরে ধীরে পা টানিয়া টানিয়া বেড়াইতেছেন উত্তর-দক্ষিণে। চলিবার সময় অসুস্থতায় একটু সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।

ভক্ত স্ত্রীলোক দুইটি যুক্তকরে অতিশয় ভক্তিভরে শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হয়, যেন মন প্রাণ শান্তি ও আনন্দে ভরপুর হইয়া আছে। এক দৃষ্টিতে কেবল দর্শনই করিতেছেন। প্রশ্নও নাই, উত্তরও নাই। কিন্তু এই মৌন ব্যবহারে সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ। অবতারাদির এই অপার্থিব দৈবী সম্পদ যাহারা উপভোগ করিতে পারে ক্ষণকালের জন্যও, সত্যই তাহারা ধন্য। প্রায় ভগবানদর্শনের আনন্দে ক্ষণকালের জন্য জগৎ ভুলিয়া এই ভক্তগণ উন্মনা, সমাধিগ্রস্থ। ব্যক্তিত্বের কি আশ্চর্য প্রভাব!

সকালে যে ভক্ত মহিলাটি শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিয়া ভগবান-দর্শনের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিলেন। আজ সারাদিনই মঠবাস করিতেছেন। এখন ঘরে ফিরিয়া যাইবেন। তাই ছোট ঘরের ভিতর দরজার কাছে দাঁড়াইলেন।

ভক্ত মহিলা (অতি বিনীতভাবে প্রার্থনার স্বরে) — বাবা, আমার

দর্শন হবে কি? এবার আমি বাড়ি যাবো।

মহাপুরুষ বেড়াইতেছিলেন, দাঁড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিতেছেন — আর ঐ ভক্তটি পাদমূলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। ভক্তটি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

আজ আবার পূর্ণিমা। এখন রাত্রি সাড়ে ছয়টা। আরতি হইয়া গিয়াছে। আকাশ সুনির্মল। গঙ্গায় কুয়াশা নাই। জোয়ার আসিয়াছে। শীতও অতি সামান্য আজ। পূর্ণিমা লাগিবে আটটায়। গঙ্গার ধারের বারান্দায় আজ মহাপুরুষ মহারাজ নৈশ আসর পাতিয়া বসিয়াছেন চেয়ারে, পূর্বাস্য। অনেকগুলি সাধু ও ভক্ত সমাগত। কেহ সম্মুখে বসিয়া আছেন, কেহ এদিক-ওদিক দাঁড়াইয়া আছেন। কোনও কথা নাই, কিন্তু কি এক নির্বাক আনন্দে আজ সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ।

পূর্বাকাশ আলো করিয়া ঐ চন্দ্রিমার উদয় হইতেছে। গঙ্গার জল ঝক্‌মক্ করিতেছে। আজ সাধু ও ভক্তের হৃদয়কমল বুঝি ব্রহ্মচ্ছটায় উদ্ভাসিত।

শ্রীমহাপুরুষ (একজন ভক্তের প্রতি) — ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসা ভাল। পূজা, আরতি, পাঠ, সাধুদের ধ্যানজপ — এসব দর্শনে উদ্দীপন হয়। আগে লোকেরা ঠাকুরবাড়ির কাছে এসে থাকতো দূর থেকে বাড়ি উঠিয়ে এনে — সর্বদা দর্শনাদি হবে বলে। যে পরিবেশে থাকে, তারই রং লাগে মনে। ব্রহ্মানন্দের আভাস পাওয়া যায় হৃদয়ে অজানাভাবে। ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব রয়েছে মন্দিরে। তিনিই সংসারতপ্ত জীবগণের জন্য তীর্থ, মন্দির ও দেবালয়ে প্রকাশিত।

শ্রীম স্থির হইয়া বসিয়া চক্ষু বুজিয়া একাগ্রচিত্তে ডায়েরী পাঠ শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীম — এ কি আর বলতে! এ কি শ্রীমহাপুরুষ বলছেন? ঠাকুরই এঁদের মুখ দিয়ে কথা কইছেন। (সাধুর প্রতি) — আর আছে কি?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ।

সাধু আবার পাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলুড় মঠ। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। সকাল সাড়ে পাঁচটা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে খাটের উপর বসিয়া আছেন।

খুব উচ্চস্বরে বলিতেছেন — ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়। মাঝে কিছুক্ষণ বিরাম। আবার বলিতেছেন — ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়। বারবার এরূপ করিতেছেন। খুব উদ্দীপনাময়ী বাণী।

একটি সাধু স্বামীজীর ঘরে টেবিলের উত্তর দিকে বসিয়া জপ করিতেছেন। ঐ শিবধ্বনি শুনিয়া তিনি প্যাসেজে দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন। বেশ জোরে বলিতেছেন। আজ যেন শিবময় হইয়া গিয়াছেন — হয়তো শিবদর্শন করিয়াছেন।

সাধু পৌনে সাতটায় শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিতে ঘরে ঢুকিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন আর মহাপুরুষ উচ্চ স্বরে ঐ ধ্বনি করিতেছেন, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়। আজ কি সব শিব দেখিতেছেন? মাঝে মাঝে এক একবার বলিতেছেন — ওঁ নমো অনন্তায়।

স্বামী নিখিলানন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আবার বলিতেছেন — ওঁ নমো নিখিলানন্দায়, ওঁ নমো নিখিলানন্দায়।

আজ শিবময় জগৎ দেখিতেছেন বুঝি! একটি অদ্ভুত সরস আনন্দময় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে আজ।

৪

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। পৌষ মাস। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসা। মাঝে মাঝে হুঁকার নলটায় এক আধবার টান দিতেছেন। এখন সকাল সওয়া সাতটা। সাধুরা প্রণাম করিতে আসিতেছেন। ঘরে আছেন স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ, ওঁকারানন্দ, বিশ্বাত্মানন্দ প্রভৃতি। খুব আনন্দময় ভাব মহাপুরুষ মহারাজের।

শ্রীমহাপুরুষ (আহ্লাদের সহিত স্বামী ওঁকারানন্দের প্রতি) — আজ সকাল থেকেই কেবলই মনে হচ্ছিল মার কথা। বিশেষ করে এই ঘটনাটি।

দেশ থেকে বাপের সঙ্গে আসছেন গঙ্গাস্নানে। রাস্তায় জ্বর হল, বেহুঁশ। রাত্রে একটি কালো মেয়ে এসে বললে, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে

এসেছি।

গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। আর সব অসুখ আরাম হয়ে গেল। এইটি কি অদ্ভুত, আশ্চর্য ব্যাপার! বোঝবার যো নাই, এ কি mystery (রহস্য)! কি বলবে একে বাংলায়?

ওঁকারানন্দ — অলৌকিক।

মহাপুরুষ (সমর্থন করিয়া) — হাঁ, অলৌকিক আর কি। এ অদ্ভুত রহস্য বোঝবার যো নাই।

শ্রীম — এ সবই অবতারলীলার সমর্থক। ভগবান মানুষ হয়ে যখন আসেন তখনই এসব দৈবলীলা প্রকট হয়।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বড়দিন। বেলা পৌনে আটটা। গঙ্গার দিকের বারান্দায় মহাপুরুষ বেড়াইতেছেন। বম্বে হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন, স্বামী বিশ্বানন্দ পাঠাইয়াছেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে স্বামীজীর ঘর দেখাইয়া বলিতেছেন, 'In this room Swamiji lived and died. We do not use the word 'die'. We say, 'gave up the body'. He lived here, practised here, taught here and gave up his body here. So, It is so holy to us – a sanctuary. we have preserved it. (এই ঘরে স্বামীজী বাস করেছেন। এই ঘরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমরা 'মৃত্যু' শব্দটি ব্যবহার করি না। বলি, শরীর ত্যাগ করেছেন। তিনি এই ঘরে বাস করেছেন। সাধন করেছেন এখানে। ধর্ম প্রচার করেছেনও এখানে। আবার শরীরত্যাগও এখানেই করেছেন। তাই এ ঘরটি আমাদের কাছে অতি পবিত্র — এটি মন্দির। আমরা এই ঘরটি মন্দিরের মতই রেখেছি।

মহাপুরুষের গায়ে খয়েরী রং-এর একটি জামা। মাথায় কানঢাকা টুপি। পায়ে মখমলের চটি।

খোকা মহারাজের ছোট ঘর দ্বিতলের। এখন প্রায় সন্ধ্যা ছয়টা। মহাপুরুষ খাটের উপর বসিয়া আছেন। নিচে মেঝেতে বসা সুন্দর বসু। ইটালীতে বাড়ি, যুবক। নামেও সুন্দর, চেহারাতেও সুন্দর। 'লক্ষ্মী বিলাস'-তৈলবিক্রেতাদের দৌহিত্র। নবযুবক। সাধু হইবার অল্পস্বল্প ইচ্ছা আছে।

স্বামীজীর ঘরের পাপোশে দাঁড়াইয়া একটি সাধু কথোপকথন শুনিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ (সুন্দরের প্রতি) — বাবা, বাহ্য সন্ন্যাস সন্ন্যাসই নয়। ভিতরের সন্ন্যাসই ঠিক সন্ন্যাস। তাঁর ধ্যান জপ চিন্তাতে ডুবে যাও, সমাধি হয়ে যাক — সেই সন্ন্যাস! ও বাইরের সন্ন্যাস কিছুই নয়।

গেরুয়া পরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে খাওয়া — এ কিছু নয়। এ তো অনেক আছে। এর সংখ্যা যত কমে ততই ভাল। তোমার তো কিছুর অভাব নাই। তোমার ঠাকুরদাদা কি সব রেখে গেছেন তোমার জন্য।

সুন্দর — দিদিমা রেখে গেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ (সংশোধন করিয়া) — হাঁ দিদিমা। দু'টি দু'টি খাও আর তাঁর চিন্তাতে ডুবে যাও। আর সৎগ্রন্থ পড়বে। দয়ার কাজ করবে। এই তো সন্ন্যাস! ঐ বাইরের সন্ন্যাস কিছুই নয়।*

আগামী কাল শ্রীমহাপুরুষের জন্মোৎসব।

শ্রীম (নীরবতা ভাঙ্গিয়া) — সত্যই তো বলেছেন। বাহিরের সন্ন্যাস তো মাত্র সাইন বোর্ড। মনও সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গান চাই। ঠাকুর বলতেন, কথাটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দে প্রেম।

সাধু আবার ডায়েরী পাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলুড় মঠ। ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে খাটের উপর বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। সামনে একটি স্টুলের উপর হুঁকা। তাহাতে একটা কাঠের লম্বা নল। মুখের কাছে নলটা। ঘরে সাধুরা কেহ আছেন। হীরেন মহারাজ জানালার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।

এখন সকাল সাতটা। সাধুরা প্রণাম করিতে আসিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। শেষের পদটি অতি আন্তরিকভাবে আবৃত্তি করিতেছেন বারংবার —

'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।'

এই যুবক পরে ত্যাগজীবন যাপনের জন্য দেওঘর বিদ্যাপীঠ গিয়াছিল। কিন্তু থাকিতে পারিল না। মহাপুরুষ অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তিনি পূর্বেই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, গৃহে থাকিয়া ধর্ম কর!

এক একবার বলিতেছেন, 'সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ'।

মহাপুরুষের মনটি যেন কোন সুন্দর সুখময় দেশে বিচরণ করিতেছে। মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও আনন্দময়! হঠাৎ নিজ মনে হাস্য করিতেছেন আর চক্ষু মেলিয়া বলিতেছেন, ঠাকুর রাত তিনটে থেকে উঠে এই রকম নাম করতেন প্রায় এই সময় পর্যন্ত। তিনটেয় উঠে হাতমুখ ধুয়ে চারটে থেকে — এখন ক'টা?

একজন — সাতটা।

মহাপুরুষ — হাঁ, এ সময় পর্যন্ত নাম করতেন।

একজন সাধু — এক নামই রোজ করতেন?

মহাপুরুষ — না। যখন যেভাবে থাকতেন সেইটাকে নিয়ে নানা রকম নাম করতেন সেই ভাবের। যখন যে ভাব আসতো ছাড়তেন না।

মহাপুরুষ পুনরায় অন্তর্মুখ, নীরব। আবার বলিতেছেন।

মহাপুরুষ — তখন তাঁর কাছে অন্য লোক থাকতো না। মহারাজ পরে কিছুদিন ছিলেন। রামলালদাদা এক একবার এসে দেখে যেতেন। উনি মন্দিরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

সকাল সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসিলেন চেয়ারে, ছোট ঘরের পাশে। কাছে শৈলেশ।

একটি সাধু বারান্দা ঝাড়ু দিয়া ঝাঁটা রাখিতে যাইতেছেন ছাদে। তিনি শুনিলেন মহাপুরুষ বলিতেছেন, তুলসীদাসের রামায়ণ ভারি মধুর (হাস্য)।

একবার মা, যোগেন স্বামী এঁরা কৈলোরে শোন নদীর উপর রয়েছেন। আমি যাচ্ছি ওঁদের কাছে। পথে এক জায়গায় রাত্রিবাস করছি। দু'টি কুলী, কি এই রকম সামান্য লোক, আমাকে রামায়ণ পড়তে বললো। ওরা পড়তে জানে না। আমি পড়লাম। তা কত ভক্তিভরে শুনলো। চলে যাবার সময় একটি টাকা দিতে চাইলে আমি নিই নি, মনে হয়। ভারি মধুর বই। আর ওদের বড় বিশ্বাস!

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। মহাপুরুষ দোতলার অফিস ঘরে বসিয়া আছেন দক্ষিণের জানালার সামনে চেয়ারে, উত্তরাস্য। গায়ে গরম কোট। তাহার উপর ফ্ল্যানেলের র‍্যাপার জড়ান। মাথায় কানঢাকা সাধুর টুপি। পা দুইটি

একটি গরম র‍্যাপারে ঢাকা। সোজা হইয়া বসিয়াছেন, পিঠটা চেয়ারে লগ্ন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুর করিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিতেছেন —

‘আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
গায়ত্রী ছন্দসাম্ মাতঃ ব্রহ্মজ্যোতিঃ নমস্তুতে॥’

খানিকটা নীরব ধ্যান। আবার গাহিতেছেন —

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।’

সেবক শঙ্কর দরজার গোড়ায় মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অপর সেবক মতি দরজার বাহিরে। সাধুরাও কেহ কেহ এদিক ওদিক দাঁড়ান। সকলে এই নির্বাক আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষের মস্তকোপরি একটি ক্ষীণজ্যোতি নীল রং-এর বালব জ্বলিতেছে। কি প্রশান্ত ভাব!

শ্রীম (গম্ভীরভাবে) — ঠাকুরের ভাবের প্রতিমূর্তিই তো তিনি। পড়ুন তারপর।

সাধু আবার ডায়েরী পাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলুড় মঠ। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ। মঙ্গলবার। সকাল সাতটা। মহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসা। একটি সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ সাধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মহাপুরুষ — কোন্ ডাক্তারের কাছে গিছলে?

সাধু — শ্যামাপদবাবুর opinion (পরামর্শ) নিয়ে অমরবাবুর কাছে গিছলাম।

মহাপুরুষ — কি বললেন ওঁরা?

সাধু — অমরবাবু বলেন এটা nervous pain (স্নায়বিক ব্যথা)। শ্যামাপদবাবু বলেন fermentative dyspepsia (অজীর্ণ রোগ)। ওতে পেটে গ্যাস হয়। সেই গ্যাস ওপরে ওঠে। তখন বুকে-পিঠে pain (বেদনা) হয়। আর তখন বসতে পারি না, শুয়ে পড়তে হয়।

মহাপুরুষ — ও বাবা! অমরবাবু আর কি বললেন?

সাধু — আমায় আর কিছু বললেন না। বললেন, ওঁদের (মঠের

বড়দের) বলবো।

মহাপুরুষ — তাই ভাল। এ বেশ।

শ্রীম — এ ডায়েরী পড়ে কত ভক্তদের উপকার হবে। ঠাকুরের ভাব তাঁর সন্তানের ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত জগতে। আরও পড়বে। দেখো না কথামৃতই কেমন করে রাখালেন! এ কি মানুষের কাজ! উনিই যন্ত্র বানিয়ে লেখালেন, জীবনে আনালেন, আর আপন কাজ করালেন।

দেখছি, এ ডায়েরী দিয়ে প্রভূত উপকার হবে ভক্তদের। ঠাকুরের ছেলেরা কি কম! তাঁরই অংশ।

সাধু মিষ্টিমুখ করিয়া প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। উনি বেলুড় মঠে যাইবেন। যাইবার সময় শ্রীম বলিলেন, শ্রীমহাপুরুষকে আমার প্রীতি নমস্কার জানিও।

বেলুড় মঠ।
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।